সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জানুয়ারি ২০১৫

১৩ জানুয়ারি ২০১৫ ত্রিপুরা সীমান্তে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা শর্মা ও বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের 'সীমান্ত হাট'এর উ দ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০১৫ বাংলাদেশের জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার জন্মদিনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

১ জানুয়ারি ২০১৫ ধানমন্ডির ২নং সড়কে অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তীর সপ্তম ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)এর উ দ্বোধন

২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি (এবিএসএসআই) আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তীর বক্তব্য প্রদান

৬ জানুয়ারি ২০১৫ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আইজিসিসি অতিথি বক্তৃতামালায় শ্রী হেইসনাম কানাইহালালের বক্তৃতা

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ বিয়াল্লিশ | সংখ্যা ১০ | পৌষমাঘ ১৪২১ | জানুয়ারি ২০১৫

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের Facebook page: /HighCommissionofIndiaDhaka
লাইক ও ভিজিট করুন ভারত বিচিত্রা Facebook page: /BharatBichitra; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Igcc Dhaka, Follow us on twitter /ihcdhaka

বাংলাদেশের নৌকা

বিজন আলোকপাত

সূচিপত্র

বাংলাদেশের নৌকা ০৪
বেগম আখতার স্মরণে ০৮
প্রাচীন শাস্ত্রে ও মূর্তিতত্ত্বে সরস্বতী ১২
ছোটগল্প: বার্গামট বাগানের বিকেলের গল্প ১৪
কবিতা ২৪
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ২৬
বিজন আলোকপাত ২৯
মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা ৩৪
ধারাবাহিক: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৭
অনুবাদ গল্প: গুপ্তা ৪২
শেষ পাতা: মহাত্মা গান্ধী ৪৮

মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা

১৯৪৫ সালে যেটি ছিল একটি ইস্পাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কয়েক দশক বাদে সেটিই একটি বহু শতকোটি রূপির ব্যবসায় গ্রুপে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারত য়েরা তে নিয়তির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জেগে ওঠে, অধুনা মুম্বই (তখনকার বোম্বে)এর দুই ভাই স্বাধীনতার প্রথম প্রহর থেকে চার চাকা উইলিস জিপ সংযোজনের কাজ শুরু করেন। এই জিপ সেদিন ভারতের মোটরযাত্রায় নতুন পথ দেখিয়েছিল।

জে সি মহিন্দ্র ও কে সি মহিন্দ্রর সেদিন দৃঢ় প্রতীতী জন্মেছিল যে, নতুন জাতির সমৃদ্ধির চাবিকাঠি হবে নতুন ধরনের পরিবহন যান। কাজেই তাঁরা মুম্বইয়ের উইলিস জিপ সংযোজনের অনুমতি চাইলেন, তাঁদের মাথায় ছিল ভারতের রাস্তায় চলাচলের উপযোগী শক্তপোক্ত অথচ সরল যান নির্মাণের।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮০২৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে...

২০০৮ সালে সাউথ পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম ঢাকার শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। সেখানে একটি ডকুমেন্টারি নাটকের আয়োজন করা হয়। মঞ্চের পেছনে একটি ফাঁসিকাষ্ঠ এবং একটি ফাঁসির রজ্জু ঝোলানো। নাটকে অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরামের দুঃসাহসী কীর্তিকে গুরুত্ব দিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ এবং বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসামান্য অবদানকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে শহীদ ক্ষুদিরামের সহযোগী বীর শহীদ প্রফুল্ল চাকীর আত্মাহুতির কথা। ক্ষুদিরাম ও মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখের ভূমিকাকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়, সেভাবে প্রফুল্ল চাকীর দিকে ক্যামেরা ঘোরে কি? বাসায় ফিরে বাংলাপিডিয়া খুঁজে প্রফুল্ল চাকীর জীবনকাহিনি পড়লাম।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এই তরুণ বিপ্লবী ও আত্মত্যাগী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার বিহার গ্রামের এক মধ্যবিত্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারে। তার পিতা রাজনারায়ণ ও মাতা স্বর্ণময়ী। পিতা ছিলেন বগুড়ার নওয়াব পরিবারের কর্মচারী। মাত্র দু'বছর বয়সে প্রফুল্ল তার পিতাকে হারান।

প্রফুল্ল চাকীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের স্কুলেই– ১৯০৪ সালে ভর্তি হন রংপুরের জেলা স্কুলে। সেখানে তিনি বান্ধব সমিতিতে যোগ দিয়ে শরীর চর্চা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় পূর্ববঙ্গ ও অসম সরকারের কার্লাইল সার্কুলার লঙ্ঘন করে ছাত্র সমাবেশে অংশ নিয়ে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর তিনি রংপুর জাতীয় স্কুলে ভর্তি হন। এসময় তিনি জীতেন্দ্রনারায়ণ রায়, অবিনাশ চক্রবর্তী ও ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীর মত বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং এর ফলে তার মনে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা জন্মাতে থাকে।

ঠিক এমনই এক সন্ধিক্ষণে যুগান্তর গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ রংপুরে আসেন। বারীন ঘোষের সঙ্গে প্রফুল্লর পরিচয় হয়। এরপর ১৯০৭ সালে বারীন ঘোষ কলকাতায় গোপন বোমা কারখানা গড়ে তুললে প্রফুল্ল চাকীকে কলকাতায় নিয়ে যান। এদিকে পূর্ববঙ্গ ও অসমের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার বিপ্লবীদের প্রতি হিংসাত্মক মানসিকতার জন্য জনগণের চরম ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। বারীন ঘোষ তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। ফুলারের দার্জিলিং সফরের সময় এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। চাকীর ওপর এ দায়িত্ব বর্তায় কিন্তু সফর বাতিল হওয়ায় সে পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

১৯০৮ সালে যুগান্তরের সদস্যরা কলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। ইনিও নিজ কৃতকর্মের জন্যে বিপ্লবীদের বিরাগভাজন হন। তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর সঙ্গে প্রফুল্ল চাকীকে এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে কিংস্ ফোর্ডকে সেশন জজ হিসেবে মুজফ্‌ফরপুরে বদলি করা হয়। দুই তরুণ মুজফ্‌ফরপুরে গিয়ে কিংস্‌ফোর্ডকে খুব কাছে থেকে কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের পরিকল্পনা তৈরি করেন। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় তাঁরা ইউরোপীয় ক্লাবের প্রধান ফটকের সামনে আত্মগোপন করে কিংস্ ফোর্ডের গাড়ির অপেক্ষা করতে থাকেন। এরপর কিংসফোর্ডের গাড়ির অনুরূপ একটি গাড়ি গেটের কাছে এলে তারা এর উপর বোমা নিক্ষেপ করে গাড়িটি উড়িয়ে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটি ছিল মিসেস কেনেডি ও তার ও কন্যার গাড়ি। ঘটনাস্থলেই দুই মহিলা মারা যান।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পৃথক পৃথকভাবে পলায়ন করেন। পরদিন সকালে সমস্তিপুর রেলস্টেশনে নন্দলাল ব্যানার্জি নামে পুলিশের এক সাব্ ইনসপেকটর প্রফুল্লকে সন্দেহ করে তাকে গ্রেফতারের জন্য উপস্থিত পুলিশের সাহায্য নেয়। প্রফুল্ল আত্মসমর্পণ না করে নিজেই নিজের রিভলবার দিয়ে মাথায় দু'বার গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

প্রফুলস্ন চাকীর আত্মদান পরবর্তী প্রজন্মের বিপস্নবীদের প্রেরণা যুগিয়েছে।

সমীররঞ্জন শীল
নিকেতন আ/এ, গুলশান্ন১, ঢাক্কা১২১২

সংগ্রহে রাখতে চাই

শহীদ আসাদুরফি গ্রন্থাগার খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার একমাত্র গণগ্রন্থাগার যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৯। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি এলাকার পাঠকদের চাহিদা পূরণ করে আসছে। এখানে পাঠকদের জন্য দৈনিক এবং সাপ্তাহিক মিলে ৬টি পত্রিকা রাখা হয়।

বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম যে, আপনাদের দপ্তর থেকে প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রা* আপনারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকেন। আমরা আপনাদের পত্রিকাটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রাখতে ও পাঠকদের সরবরাহ করতে চাই।

এমএ মোস্তাকিন সভাপতি
শহীদ আসাদুরফি গ্রন্থাগার
ফুলতলা বাজার, খুলনা

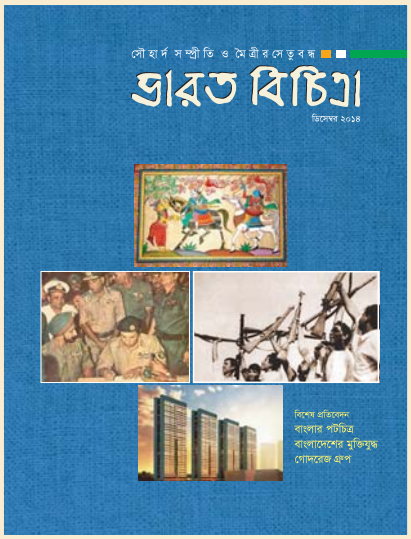

উপায় কি

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* বাংলাদেশ এবং ভারতের জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে। দু'দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা যেন একইসূত্রে গাঁথা। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ ভারত সম্পর্কে জানতে হলে একমাত্র জনপ্রিয় *ভারত বিচিত্রা* পড়া চাই এবং এর কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না।

আমি দীর্ঘদিন যাবত নিয়মিতভাবে *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করেছি। ১৯৮৯ সালে পাবনা থেকে আমি ঢাকায় চলে আসি। এরপর থেকে আর নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি পড়া হয়নি। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে পড়ে থাকি। নিয়মিত পড়তে চাইলে উপায় কি?

সৈয়দ একরামুল হক প্রিন্সিপাল অফিসার
অগ্রণী ব্যাংক লি. তেজগাঁও শি/এ কর্পোরেট শাখা
৩১৫/এ, তেজগাঁও শি/এ, ঢাক্কা১২১৫

নির্ভরযোগ্য মনে করি

বহুল প্রশংসিত *ভারত বিচিত্রা*র গ্রাহক হিসেবে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে আপনাদের সরবরাহকৃত মাসিক সংখ্যাটি যথাসময় আমার ঠিকানায় পৌঁছে যেত। বেশ কিছুদিন হল আমার নিজ অঞ্চল বরিশালে আসার পর নানান ব্যস্ততায় ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয়টি আপনাদের অবহিত করা হয়নি কি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। প্রায় সমাপ্তির পথের চাকরিজীবন সময় কাটানোসহ মনের খোরাক ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ভারত বিচিত্রাকে নির্ভরযোগ্য মনে করি। আমার বর্তমান কর্মস্থলে কি ভারত বিচিত্রা পাঠানো সম্ভব?

নিখিলচন্দ্র মিশ্র অফিসার
সোনালী ব্যাংক লি. বরিশাল কর্পোরেট শাখা

সম্পাদকীয়

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকাই প্রধান বাহন ছিল বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবধি। কতশত নৌকা, কত রকমের নৌকা! কোশা থেকে টাবুরে, সাম্পান থেকে গয়না, বজরা থেকে ডিঙ্গি, পাটাম থেকে শালতি– তালের ডাঙা থেকে ভেলা পর্যন্ত। যাতায়াত, পণ্য পরিবহন, মাছ ধরার জন্য কত রকমের যে নৌকা! নদীতে সারি সারি নৌকা। তার মধ্যে আবার আছে বাইচের নৌকা। বর্ষার দিনে দামাল হাওয়ার বিপরীতে গুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে মালবাহী ভারী নৌকা দুই পেষল যুবা– জয়নুলের এই ছবি আমাদের খুব চেনা।

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় সড়কপথ তৈরি হয়েছে। পুরপ্রকৌশলীদের শিক্ষার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সড়কপথ নির্মাণ। সড়ক নির্মাণে যাতায়াত সুগম হয়েছে, কিন্তু ভ্রমণের আনন্দ অনেকাংশে উবে গেছে। যাযাবর যেমন দৃষ্টিপাতে লিখেছিলেন, বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। বিগত শতকের নৌকার সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে মায়েদের মেয়েদের নাইওর যাওয়া কমেছে, নদী নিয়ে বিরহের গান রচনা কমেছে। এখন নদী প্রায় স্মৃতি– বিগত দিনের স্মৃতি। কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে। আমার একটা নদী ছিল জানল না তো কেউ! হায় নদী! কুল নাই কিনার নাই। অথৈই নদীতে নৌকার দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়ার স্মৃতি আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মনে কী আছে!

নৌকা ও নদী নিয়ে এত কথা মনে পড়ল আমাদের অতিপ্রিয় সদ্যপ্রয়াত শিল্পগুরু কাইয়ুম চৌধুরীর 'বাংলাদেশের নৌকা' শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ সুলিখিত নিবন্ধপাঠে। শ্রদ্ধেয় কাইয়ুম চৌধুরী তুলির পাশাপাশি হাতে কলম তুলে নিলে অবন ঠাকুরের মত সাহিত্যসৃষ্টির সাক্ষী হতে পারত বাংলা ভাষা। স্মৃতিবাহী, স্মৃতি উদ্রেককারী এমন রচনার জন্যে তিনি তাঁর চিত্রকর্মের পাশাপাশি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম নিয়ামক, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ও প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে এক বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। দিল্লির বিড়লা ভবনে এক সান্ধ্যপ্রার্থনা সভায় যোগ দেবার পথে নাথুরাম গডসে নামে এক যুবক তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে। অন্তিম মুহূর্তে তিনি দু'টিমাত্র শব্দই উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন– 'হে রাম'। তাঁর স্বপ্ন ছিল শোষণ অত্যাচার নিপীড়নমুক্ত প্রজাবান্ধব এক অসাম্প্রদায়িক ভারতের, এক রামরাজত্বের– যেখানে হিংস্রাবি দ্বেষ থাকবে না, সবাই সুখেশান্তিতে বসবাস করবে।

গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর দেহভস্ম গঙ্গা, নীল, ভোলগা, টেমস প্রভৃতি বিশ্বের প্রধান কয়েকটি নদীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উত্তরকালে যিনি বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠবেন, তাঁর দেহভস্ম তো বিশ্বের সবখানেই ছড়িয়ে পড়া উচিত!

নিবন্ধ

বাংলাদেশের নৌকা

কাইয়ুম চৌধুরী

নদীর সঙ্গে আমার সখ্য সেই শৈশবকাল থেকে। কবিতার ছন্দ, নদীর ছন্দকে গেঁথে দিয়েছে আমার মনে। '–আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।' বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে বয়ে যাওয়া নদীর এই চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে এঁকে দিয়েছিলেন। শৈশবে আমার প্রথম নৌভ্রমণ ঘটেছিল বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সুবাদে– চাঁদপুরে। গ্রামের বাড়ি শর্শদি থেকে চাঁদপুর লাইনে ট্রেন। চিতোষী নামক স্টেশনে এক চন্দ্রালোকিত রাতে অবতরণ। তারপর নৌকায় যাত্রা পয়ালগাছা হয়ে আদ্রা নামক গ্রামে। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ধারে ধারে খাল, তারপর ধানখেতের ওপর দিয়ে যাত্রা। ছোট নৌকা– পানসি ধরনের। নৌকার গায়ে ধানগাছের ঘষটানোর শরশর শব্দ। বাইরে সাদা কুয়াশাঘেরা জ্যোৎস্না। সে এক মায়াময় সৌন্দর্য। ধানখেত পেরিয়ে নৌকা একসময় বাড়ির বাইরের পুকুরে ঢুকে অন্দরে সিঁড়ির গোড়ায়। এই ছিল নৌপথ। কোথায় না যাওয়া যেত। বড় নদী ছেড়ে শাখা নদী, জলাভূমি, খাল, বিল পেরিয়ে একেবারে পুকুরঘাটে। কত রকমের নৌকার ব্যবহার। তালের ডোঙা থেকে শুরু করে ডিঙি নৌকা, পানসি, পাটাম, শালতি, কলার ভেলা–এ গুলো সব গ্রামাঞ্চলে, বর্ষায় যখন এক-একটি গ্রাম দ্বীপের আকার ধারণ করত তখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হত। বাংলার এবং বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় বাহন ছিল এই নৌকা। কত রকমের নৌকা তৈরি হত তখন বাংলাদেশে। নদীমাতৃক বাংলাদেশ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখা-প্রশাখায় বিভাজিত। এই নদীপথই একসময় বাংলার সড়কপথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৌ-নির্ভরতা এতটাই ছিল যে নৌকার ভূমিকা বাঙালি জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৌকার ব্যবহার তার সংস্কৃতিতেও এক বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। শুধু যাতায়াতই নয়, পণ্য পরিবহনে একসময় নৌকাই ছিল প্রধান ভরসা। মাছ ধরার জন্য নৌকার ভূমিকা এখনো অনস্বীকার্য।

মাছেভা তে বাঙালি, সুতরাং মাছ ধরার জন্য কত রকমের নৌকা প্রস্তুত হয়েছিল তার হিসাব নেই। বড় নদীতে, ছোট নদীতে, খালেবি লে, জলাভূমিতে মাছ ধরার নানা নকশার নৌকা তৈরি করা হতো। গভীর নদীতে মাছ ধরার জন্য এক রকমের নকশা, আবার খালেবি লের অন্য রকম, খরস্রোতা নদীর জন্য, উপকূলে মাছ ধরার জন্য, গভীর সমুদ্রের জন্য নানা ধরনের নানা আকারের নৌকা প্রস্তুত করা হত। প্রাচীন বাংলায় নৌযান তৈরির বড় অবস্থান ছিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলার জলযানের বড় চাহিদা ছিল। বাংলার নৌকা সরবরাহ করা হত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। ব্যবসায়ীরা সমুদ্রগামী নৌকা নিয়েই মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে ব্যবসাপণ্য নিয়ে যাতায়াত করত এবং সেই নৌকা তৈরি হতো বাংলাদেশেই।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর তিনটি নদী পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আমাদের বাংলাদেশে। ছবি আঁকতে গিয়েই নদী আর নৌকা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। কৈশোরকালে আমার একটা বিরাট সময় কেটেছে নদীকূলে। তখন বাবার চাকরিসূত্রে নড়াইলে। চিত্রা নদীর পাড়ে আমাদের বাসা। সে সময় চিত্রা নদীতে জোয়ারভাটা খেলত। ঘোলা পানি। নদীতে এক প্রকার ছোট ছোট নৌকা। নাম টাবুরে। বাসার সামনেই দুচারটি বাঁধা থাকত। মাঝি দের জীবনযাত্রা দেখতাম। হুঁকো টানতে টানতে ভাত রান্না করছে। উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়। আমরা দুই ভাই গুটিসুটি মেরে নৌকোর দুলুনি উপভোগ করতাম। সে দুলুনি আরও প্রকট হত যখন আর এস এন কোম্পানির জাহাজ ভামো, কিউই, অস্ট্রিচ জল কেটে মাগুরার দিকে চলে যেত। এখন আর চিত্রা নদীতে জোয়ারভাটা খেলে না। জাহাজপথ বন্ধ। চিত্রা নদীতে সে সময় জেলেরা জেলেডিঙি নিয়ে মাছ ধরত বড় খেপলা জাল নিয়ে। জেলেরা ভোঁদড় পুষত জালের দুপাশ থেকে মাছ তাড়িয়ে জালে ফেলার জন্য। এখন সেসব কিছু নেই। এখন দুএকটি জাহাজ যেমন অস্ট্রিচ, মাসুদ, লেপচা, টার্ন ঢাকাবরিশালখুলনা যাতায়াত ক রে। আমার অত্যন্ত প্রিয় জলপথ ঢাকাবরিশালখুলনা। যখনই সু যোগ পাই ভ্রমণ করি। নদীর দুপাশ দেখি। পঞ্চাশের দশকে দেখতাম নানা নকশার নৌকা, নানা রঙের পাল উড়িয়ে নদীর বুকে রাজহাঁসের মত ভেসে চলেছে। এখন আর সে দৃশ্য চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে না দাঁড়ি নৌকা। এখন শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভটভট করে জল কেটে যায়। দাঁড় নেই, শুধু হাল। দাঁড় দেখা যায় একমাত্র বাইচের নৌকাতে। অনেক নৌকা আমাদের নদীপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেক নতুন নৌকা দেখি। আগে কাঠ ব্যবহৃত হত নৌকা তৈরিতে। মজবুত টেকসই। কাঠ জোড়া দেওয়া হত বেতের বাঁধনে। গজাল, পেরেক, কাঠের হুড়কো ব্যবহৃত হত। এখন কাঠের বদলে মেটালশিট এসেছে। নৌকা তৈরির কলাকৌশল পাল্টেছে। আধুনিকতা এসেছে এ পরিবর্তনে। কিন্তু এখনো দেখি উত্তরবঙ্গে সেতুর অভাবে, নৌকার অভাবে সেই আদিম বাহন মাটির গামলায়, যাকে তিগারি বলে, স্কুলপড়ুয়ারা নদী পারাপার করছে। কোথাও মাটির হাঁড়িতে বই ফেলে নিজেরা সাঁতরে পার হচ্ছে।

তালগাছ কুঁদে তেলো ডোঙা, তারও আগে কলার ভেলা– এখনো বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নদীপথে দেখা যায়। মাটির কলসি একসঙ্গে (নয়টি) বাঁশ দিয়ে বেঁধে তার ওপর বাঁশের দরমা বেঁধে মৃৎপাত্রের ভেলা তৈরি হয়। বন্যাকবলিত স্থানে এ ধরনের ভেলা এখনো দেখা যায়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে যাত্রী পরিবহনের জন্য গয়না নামের এক ধরনের নৌকা চলাচল করত। সড়কপথে এখন যে রকম বাস চলাচল করে অনেকটা সে রকম। নানা ধরনের যাত্রী নিয়ে দূরদূরা ন্তে পাড়ি জমাত। পানসি নৌকাও যাত্রী পরিবহন করত। মাল বহন করার জন্য বড় নৌকা নদীবন্দরে চলাচল করত। এর মধ্যে ঢাকাই পলওয়ার, কাটুরা ভারী পণ্য বহন করার জন্য ব্যবহৃত হত। কয়লা, বালু বহন করার জন্য হোলা নামের এক ধরনের নৌকা ছিল। এখন বালু বহন করার জন্য শীতলক্ষ্যা নদীতে দেখি মেটাল বডির নৌকা। বালুর ওজনে পানির ওপর গলুই আর হালের অংশটি শুধু পানির ওপর জেগে থাকে। মাল পারিবারিকভাবে বহনের জন্য কোশা নামে এক প্রকার নৌকা ছিল। কোশা ছোট আকারে ২০ ফুট৩০ ফুটও ছিল, আবার বড় আকা রেও ছিল। বড় কোশা ব্যবহৃত হতো গরু, ছাগল পরিবহনে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাংলার ব্যবসায়ীরা সমুদ্র পাড়ি দিতেন বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য। সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি হত বাংলাদেশে। ঝড়, ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করার জন্য জাহাজের নকশা হত পোক্ত। সমুদ্রগামী জাহাজ প্রত্যক্ষ করেছিলাম নদীপথে সন্দ্বীপ যাওয়ার প্রাক্কালে।

বাংলায় সবচেয়ে দ্রুতগামী নৌকা হিসেবে ব্যবহৃত হত ছিপ নৌকা। গল্প উপন্যাসে পড়েছি এ নৌকা ডাকাতরাই ব্যবহার করত বেশি। দ্রুততার সঙ্গে পণ্য লুণ্ঠন করে দ্রুতগতিতে সটকে পড়ত। এখনো ছিপ নৌকা নদীপথে দেখা যায়। কোশা নৌকার মত মাল পরিবহনের নৌকা ছিল ঘাসী। আর কুমোরেরা তাদের তৈরি মৃৎপাত্র বাজারে নিয়ে যেত সরঙ্গা নামের নৌকাতে। বাঁশের ঘের দেওয়া কাঠামোর মধ্যে লাল রঙের কলসি হাঁড়ি উপুড় করে সাজিয়ে বাজারে নিত। দূর থেকে দেখতে ছিল দৃষ্টিনন্দন। আঁকার জন্য হাত নিসপিস করত।

বাংলার জমিদারেরা উৎসবাদিতে, আনন্দফুর্তি র জন্য বজরা ব্যবহার করতেন। বড় বজরায় নৃত্যগীতের আয়োজন করা হত। নদীবক্ষে ভেসে গানবাজনার আসর আ লোকাজ্জ্বল বজরায় দৃষ্টিনন্দন ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি দেখভাল করার জন্য শিলাইদহ, পতিসর ও শাহজাদপুরে ছোট বজরা, যাকে পানসি বোটও বলা হত, ব্যবহার করতেন। ছিন্নপত্র রচিত হয়েছিল এই পানসি বা পদ্মাবোটে বসেই। প্রকৃতিবিষয়ক বহু সংগীত তিনি রচনা করেছিলেন পদ্মাবোটে নদীভ্রমণের মাধ্যমে।

আরও বহু নামের নৌকা বাংলার নদীপথে চলাচল করত। এখনো তার কিছু কিছুর সন্ধান মেলে। অঞ্চলভেদে নামের পরিবর্তন হয়। নদীর মত। একই নদী এক অঞ্চলে একেক নামে পরিচিত। আড়িয়াল খাঁ বরিশাল অঞ্চলে কীর্তনখোলা, একটু এগোলে সুগন্ধা, সন্ধ্যা নামে পরিচিতি পায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাম্পান এখনো বিদ্যমান। সাম্পান হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে সবচেয়ে বহুল পরিচিত নৌকা। সাম্পান চিনা সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। সাম্পান নামটা চিনা ভাষা থেকে এসেছে। 'সাম' মানে তিন এবং 'পান' মানে পার্শ্ব। ছোট আকারের সাম্পানে ছই থাকে না। বড় আকারে সাম্পানে ছই থাকে এবং সেই সাম্পান সমুদ্রগামী। ব্যবসাবাণি জ্যের জন্য বাংলার ব্যবসায়ীরা সমুদ্র পাড়ি দিতেন বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য। সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি হত বাংলাদেশে। ঝড়, ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করার জন্য জাহাজের নকশা হত পোক্ত। সমুদ্রগামী জাহাজ প্রত্যক্ষ করেছিলাম নদীপথে সন্দ্বীপ যাওয়ার প্রাক্কালে। নোয়াখালী থেকে সন্দ্বীপ, বাবার চাকরিসূত্রে পাড়ি দিতে হয়েছিল এই মেঘনার মোহনা। এই বিশাল মোহনায় এলোপাতাড়ি স্রোতোধারা অতিক্রম করে সন্দ্বীপে পৌঁছনো এক বিরাট অভিজ্ঞতা। চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপের সওদাগরদের নৌকো চলাচল করত উপকূল ছুঁয়ে আরাকান, রেঙ্গুন পর্যন্ত। তখন দেখেছি চট্টগ্রামে বাতেন সওদাগরের বিশাল বিশাল সমুদ্রগামী নৌকো। মালার, বালাম, সাম্পান নানা আকৃতির। সবই বিশাল সমুদ্রপথ পাড়ি দিচ্ছে পণ্যসামগ্রী নিয়ে। উপকূলে মাছ ধরার নৌকোও বিশালাকৃতির। অনেকটা আরব উপকূলের নৌকোর আদলে তৈরি। আনন্দ হয় যখন দেখি বর্তমানে বাংলাদেশে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মিত হচ্ছে এবং তার ক্রেতা ইউরোপীয় দেশ।

নদীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেল যখন ছবি আঁকা শুরু করি। নৌকো, নদীর, জেলে, মাছ তখন ছবি আঁকার বিষয়বস্তু। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবিতেও নদী-নৌকো। তাঁর সঙ্গে ছবি আঁকতে বেরিয়েছি বুড়িগঙ্গায়। সারা দিন নৌকোয় ঘুরে বেড়ালেন, ছবি আঁকলেন না। অধৈর্য আমরা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব এল, 'আরে মিয়া নৌকার দুলুনিই যদি না বুঝলা তবে নৌকার ছবি আঁকবা কেমনে?' স্যারের ছবিতে নৌকা দেখলাম, নদী দেখলাম, নদীর দুলুনিও দেখলাম।

পত্রিকায় চাকরি করার সুবাদে ইলাস্ট্রেশন করতে হত। একবার নৌকার একটি ইলাস্ট্রেশন করেছি খুব নকশামণ্ডিত। বাইচের নৌকা

আমাদের শিল্পসাহিত্যে নদী, নৌকার ভূমিকা একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে। সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি, অদ্বৈত মল-বর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম স্মরণীয় সৃষ্টি। সংগীতের একটি সমৃদ্ধতর অংশ নদী, নৌকা নিয়ে।

যেভাবে রঙিন নকশাবৃত অনেকটা সে রকম। লাল রঙের গলুই। গলুইতে চোখ আঁকা। তারপর ঢেউয়ের আদলে পুরো নৌকার গায়ে হলুদ, সবুজ, নীলের ঢেউ, যাতে পানির ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে থাকে। ইলাস্ট্রেশন দেখে শিল্পাচার্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ নৌকা তুমি কোথায় দেখেছ? উত্তর দিলাম, পদ্মার বুকে সিলেট অঞ্চলের নৌকা। আমি তখন ছবি আঁকি না। শিল্পাচার্য আমাকে বললেন, 'এই রকম নৌকো নিয়ে ছবি আঁকতে পারো না? নদীর ঘাটে একটা নৌকা বাঁধা, একটা গলুই, একটা চোখ। দুইটা মাঝখানটায় নদীর পানি এধার ওধারে ভাসিয়ে নেয়। আগে যাত্রী এবং নৌকা, দুইটা গলুই, দুইটা চোখ। অনেকগুলো নৌকা, অনেকগুলো গলুই, অনেকগুলো চোখ, ঘাটে বাঁধা। চেয়ে আছে, বিভিন্ন কম্পোজিশনে।' আমার ছবি আঁকার দর্শনটাই বদলে গেল। আমার ছবিতে নৌকা, নৌকার গলুইয়ে চোখ প্রাধান্য পেয়ে গেল। নদীতে যদি স্রোত না থাকে বাতাস না থাকে তখন নৌকা এগিয়ে নেওয়ার জন্য গুণ টানতে হয়। মাস্তুলের সঙ্গে দড়ি বেঁধে একজন কী দু'জন মালা তীর ঘেঁষে নৌকা টেনে নিয়ে যায়। শিল্পাচার্যের আঁকা একটি বিখ্যাত ছবি গুণটানা।

আমাদের শিল্পসাহিত্যে নদী, নৌকার ভূমিকা একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে। সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি, অদ্বৈত মল-বর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম স্মরণীয় সৃষ্টি। সংগীতের একটি সমৃদ্ধতর অংশ নদী, নৌকা নিয়ে। সারিগান মাঝিমাল্লাদের সমবেত সংগীত নৌকা বাওয়ার সময়। ভাটিয়ালি গান নদীবক্ষ ছাড়িয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যার আবেদন হৃদয়ের মর্মস্থলে পৌঁছে যায়। আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠে, 'কূল বাঁকা, গাঙ বাঁকা, বাঁকা গাঙের পানি রে, বাঁকা গাঙের পানি, সেই বাঁকায় বাইলাম নৌকা, হায়, হায়– ঘর নাহি জানি রে, দুরন্ত পরবাসী।' জসীমউদ্‌দীনের লেখায় 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া, তুমি অফরবেলায় নাও ভাসাইয়া যাওরে, ও দরদি কার বা পানে চাইয়া রে, ও আমি কোন কূল হতে কোন কূলে যাব, কাহারে শুধাইরে–' যেন ক্যানভাসটা আমার নদী, কূলকিনারা পাচ্ছি না। কী আঁকব কিভাবে আঁকব বিভিন্ন ঋতুতে নদীর রূপ পাল্টে যায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত, বসন্ত। নদীর দুই তীর পাল্টে গেলে নদীও পাল্টে যায়। গ্রীষ্মে উদ্দাম স্রোতে পাড়ভাঙা তীরে দিগম্বর বালকদের নদীতে লাফানো। বর্ষায় ওপার থেকে ধেয়ে আসা বৃষ্টি কুয়াশার মত, মাছ ধরার নৌকাগুলোকে অদৃশ্য করে দেওয়া, ঢেউয়ের আড়াল থেকে ভেসে ওঠা নৌকার গলুই এবং জেলের জাল, শরতে নদীর দুধার সবুজে ছাওয়া, পাঁচন হাতে রাখালের নানা রঙের গরু চরানো, কোথাও এপার থেকে সাঁতরিয়ে নদীর মাঝে সৃষ্ট চরে ওঠা, হেমন্তে নদীর দুধার হলুদ। শর্ষেখেতের মাঝবরাবর লাল শাড়ি পরা গ্রাম্য কিশোরী, ছাগশিশুকোলে। শীতে কুয়াশাবৃত নদী, হালকা ওয়াসে নৌকা, মাঝির হাঁক, সাবধানবাণী, স্টিমারের ভোঁ। তার পরই আলো ঝলমল বসন্ত নদী। এসবই বাংলার নদী, আমার ক্যানভাস।

আলোকচিত্রী তাহের নদীপথে আমার ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন বেশ কয়েকবার। ছবি তুলেছেন প্রচুর। নৌকার। নানা নকশার। তাহেরের ছবি দেখাটা আমার কাছে আর একবার নদীভ্রমণ। গঞ্জের ঘাটে নৌকা, ভাঙা কূলে লঞ্চঘাট, লগি ঠেলে নৌকা, মেয়েদের বাপের বাড়ি যাওয়া, মাঝনদীতে কলের গান বাজিয়ে বরযাত্রীর নৌকা। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি নিয়ে ভাসমান নৌকা, ইলিশ মাছ ধরার জাল। এক পায়ে বৈঠা বাওয়া, দুই হাতে জাল, এমনি নানা ছবি, তাহেরের ছবি তোলার মুনশিয়ানায় স্মৃতিকাতর হই। আবার ভ্রমণের ইচ্ছে জাগে....

কাইয়ুম চৌধুরী শিল্পগুরু

ভ্রমণ

বেগম আখতার স্মরণে

অনিল কুমার সাহা

৭ অক্টোবর ২০১৪। ঢাকা বিমান বন্দর থেকে দিলি-ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর যাবার জন্য প্রস্তুতি। জেট এয়ারওয়েজ। সকাল ১০.২০মিনিট। আমার সফরসঙ্গী দেশের বিশিষ্ট তবলাশিল্পী সৈয়দ সাজিদ হোসেন ও হারমোনিয়াম সহযোগিতায় অলোককুমার সেন, অলোক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। বিমানবন্দরের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা শেষে জেট এয়ারওয়েজের সিটে বসা। তারপর চা-কফি, দুপুরের খাবার খেয়ে গল্প করতে করতে, মজা করতে করতে, বিমান থেকে বিভিন্ন দৃশ্য দেখে অলোকের ক্যামেরায় ছবি তুলতে তুলতে আমরা ভারতীয় সময় সকাল ১১.৫০ মিনিটে দিলি-ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম।

দিলি-ইন্দিরা গান্ধী বিমান বন্দর অনেক সুন্দর। বিমান বন্দরে নেমে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বাইরে গিয়ে দেখি আইসিসিআর আসলাম খান লেখা সুদর্শন ও স্মার্ট ২৫-৩০ বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জন্য আইসিসিআর-এর এই কর্মকর্তার অপেক্ষায় থাকার কথা। আসলামের সঙ্গে আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। ঢাকা থেকে জানানো হয়েছিল, দিলি-ত রাত্রিযাপনের পরের দিন ভোরে আমাদের চণ্ডীগড় যেতে হবে। কিন্তু আসলাম জানালেন প্রোগ্রামে একটু পরিবর্তন করা হয়েছে, আমরা হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে সড়কপথে ঐ গাড়িতেই চণ্ডীগড় যাব। যথারীতি তাই হল, পরিষ্কার ও সুন্দর মহাসড়ক ধরে আমরা চণ্ডীগড়ের দিকে রওনা হলাম।

হিমাচলের পথে এক ঘণ্টা যাবার পর একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে লেক বা নদী– এত অপূর্ব দৃশ্য বলে বোঝানো যাবে না। তবে ভয়ও হচ্ছে, একে চড়াই-উৎরাই, তায় খুব প্রশস্ত নয়– প্রচুর গাড়ি ও ট্রাক একইসঙ্গে চলছে। রাস্তায় একটু পরপর ধাবা– একটিতে থেমে সকালের নাস্তা সেরে আবার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। এভাবেই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা কুলুতে আমাদের নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো। আমার একটু চিন্তা ছিল সাজিদ ভাইকে নিয়ে। এত বড় জার্নি করার কথা ভাবতে পারিনি।

আমাদের কাছে নতুন জায়গা, রাস্তার দু'ধারে দেখার মত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, আর একটু পরপর ধাবা (একধরনের পঞ্জাবি খাবারের দোকান)। আমরা একদু 'ঘণ্টা পরপর গাড়ি থেকে নেমে চাকফি খাচ্ছি আর রাস্তার দু'পাশের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছি। সাজিদ ভাই অনেক মজার মানুষ– তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অলোক ও আসলামভাই। সারা রাস্তা মজা করতে করতে আমরা রাত ৮.০০টার দিকে চণ্ডীগড় পৌঁছলাম। প্রথমেই গেলাম আইসিসিআরএর এক কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে প্রাচীন কলাকেন্দ্র মূল অফিসে। তারপর নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে একটু ফ্রেস হয়ে রাতের ডিনারশেষে বিশ্রাম।

পরের দিন ভোর ৫.০০টায় হিমাচল প্রদেশের কুলুতে যাবার জন্য ওই গাড়িতে উঠে বসলাম। হিমাচলের পথে এক ঘণ্টা যাবার পর একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে লেক বা নদী– এত অপূর্ব দৃশ্য বলে বোঝানো যাবে না। তবে ভয়ও হচ্ছে, একে চড়াইউৎরাই, তায় খুব প্রশস্ত নয়– প্রচুর গাড়ি ও ট্রাক একইসঙ্গে চলছে। রাস্তায় একটু পরপর ধাবা– একটিতে থেমে সকালের নাস্তা সেরে আবার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। এভাবেই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা কুলুতে আমাদের নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো। আমার একটু চিন্তা ছিল সাজিদ ভাইকে নিয়ে। এত বড় জার্নি করার কথা ভাবতে পারিনি। তবে কোন অসুবিধা হয়নি, আসলে এই সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখে আমরা সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের গাড়ি যিনি চালাচ্ছিলেন, সেই সোমনাথজির পাকা হাত। খুব ভালমানুষ, যখন যেমনভাবে বলেছি, সেইভাবেই গাড়ি চালিয়েছেন। ওখানে গিয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম– বৃষ্টি ও শীতের আমেজ। হোটেলে গিয়ে স্নানখাওয়া শেষ করে একটা ভাতঘুম দিলাম।

আমাদের জানানো হয়েছিল, ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় কুলুর দশেরার মেলায় আমাদের প্রোগ্রাম, পরে জানতে পারলাম, প্রোগ্রামটা পরের দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ ৯ অক্টোবর। একটু বাড়তি সময় পাওয়ায় কাছাকাছি জায়গাটা দেখতে ঘুরতে বের হলাম। কিন্তু বৃষ্টি আর ছাড়ে না, একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে শীতের হাওয়া– সবকিছু মিলিয়ে অন্যরকম আবহাওয়া। তবু তারমধ্যে বের হলাম। পরে হোটেলে ফিরে রাতের ডিনার সেরে শীতের আমেজে ঘুম।

পরের দিন ভোরে জানলা দিয়ে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা এককথায় অপার্থিব। চারিদিকে পাহাড় মাঝখানে আমাদের হোটেল– কি সুন্দর এক সকাল! সকালের খাবার খেয়ে আমরা মার্কেট ঘুরে দেখলাম– শুধু শালের দোকান ও শালের কারখানা। সবাই মিলে কিছু কেনাকাটা হল। হোটেলে ফিরে দুপুরের খাবার শেষ করে বিশ্রাম। বিকাল চারটার সময় বের হলাম কুলু-দশেরার মেলায় যেখানে ১২টি দেশের শিল্পীদের নিয়ে ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। হোটেল থেকে যেতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগল পৌঁছতে। অসম্ভব ভিড়– চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না,পাহাড় কেটে গ্যালারির মত করে

গাড়িতে যেতে যেতে মনোরম সবকিছু দেখতে দেখতে সামনে যাচ্ছি– একটা ধাবায় সকালের খাবার খেলাম। বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছবি তোলার ধুম...। দুপুর ২.০০টায় চণ্ডীগড় শহরের একটা হোটেলে উঠে স্নান-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমার একক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি শুরু করলাম। গাড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগেছে, প্রাচীন কলাকেন্দ্র মিলনায়তন... আইসিসিআর থেকে বেশ ক'জন কর্তাব্যক্তি ও বেশির ভাগ পঞ্জাবি বা শিখ শ্রোতা।

সাজানো হয়েছে বসার স্থান, হাজার হাজার মানুষ উপভোগ করছে বিভিন্ন দেশের উপস্থাপনা, আমরা চেয়েছিলাম আমাদের প্রোগ্রাম নীচে কার্পেটে বসে করতে, সেইমতই সব ব্যবস্থা করা হল। আমাদের জন্য নির্ধারিত সময় ১৫.০০মিনিট, আমি রাগ মধুমন্তি তিনতালে শুরু করলাম... আমার ভয় হচ্ছিল, সামনের শ্রোতারা আধুনিক মানুষ এবং বিভিন্ন ধরনের নৃত্যঅভিনয়সহ পরি বেশন দেখেছেন, এর মধ্যে আমার উচাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন তাঁদের ভাল লাগবে কিনা। মনে ভয়, কী হয়, কী হয়! কিন্তু না, সবাই মনোযোগসহকারে আমাদের পরিবেশন উপভোগ করছেন, আমার সঙ্গে খুবই মেজাজ নিয়ে তবলায় সাজিদ ভাই ও হারমোনিয়ামে অলোক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানশেষে আয়োজকদের সবাই ও সাধারণ শ্রোতাদের অনেকেই আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি অনুষ্ঠান করে।

অনুষ্ঠান শেষ করে গাড়িতে ফিরছি, চারিদিকে পাহাড়, পাহাড় কেটে বড় বড় অনেক বিল্ডিং তৈরি করা, রাতে মনে হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে জোনাকির আলো টিপ টিপ করছে। আলোর ঝিলমিল আর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আমরা হোটেলে পৌঁছে গেলাম। রাতের খাবার শেষ করে যার যার রুমে গেলাম, পরের দিন ভোরে চণ্ডীগড় ফিরতে হবে, সন্ধ্যায় প্রাচীন কলাকেন্দ্র মিলনায়তনে আমার একক প্রোগাম।

১০ অক্টোবর শুক্রবার ভোর ৫.০০টা। হিমাচল কুলু-হোটেল থেকে গাড়িযোগে চণ্ডীগড় যাবার জন্য প্রস্তুতি এবং শুরু হল পথচলা। গাড়িতে যেতে যেতে মনোরম সবকিছু দেখতে দেখতে সামনে যাচ্ছি– একটা ধাবায় সকালের খাবার খেলাম। বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছবি তোলার ধুম...। দুপুর ২.০০টায় চণ্ডীগড় শহরের একটা হোটেলে উঠে স্নানখাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমার একক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি শুরন্ন করলাম।

গাড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগেছে, প্রাচীন কলাকেন্দ্র মিলনায়তন... আইসিসিআর থেকে বেশ ক'জন কর্তাব্যক্তি ও বেশির ভাগ পঞ্জাবি বা শিখ শ্রোতা। দেড় ঘণ্টা আমার পরিবেশন– প্রথমে রাগ পুরিয়া কল্যাণ– বড় ও ছোট খেয়াল, সাজিদ ভাইয়ের তবলা ও অলোকের হারমোনিয়াম সহযোগিতায় আমার গান করতে ভাল লাগছিল, ছোট ছোট করে তিনতালে বেশ কিছু ছোট খেয়াল পরিবেশন করে অনুষ্ঠান শেষ করলাম। খুব ভাল লাগল, শ্রোতারা এত মনোযোগ দিয়ে আমার গান শুনবেন– ভাবতে পারিনি। অনুষ্ঠানশেষে অনেকে কাছে এসে তাঁদের ভাল লাগার কথা জানালেন। একজন প্রবীণ সর্দারজি বললেন, আশা করেছিলাম আপনি ঝিনঝুটি রাগ গাইবেন। সবার আপ্যায়নে আমরা খুব খুশি হলাম।

১১ অক্টোবর সকাল ৬.৩০মিনিটে হোটেলে সকালের খাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম চণ্ডীগড় থেকে দিলিস্নর উদ্দেশে, দুপুর

২.৩০মিনিট আমরা দিলি- হোটেলে এসে পৌঁছলাম। খুবই সুন্দর মহাসড়ক– যাদের বেড়াবার অভ্যাস, তাঁরা একবার ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সড়কপথে বেড়িয়ে আসতে পারেন, আমি নিশ্চিত– ভাল লাগবে। বিকাল ৫.০০টায় দিলি-আজাদ ভবন অডিটোরিয়ামে আমাদের বাংলাদেশের শিল্পী প্রিয়াংকা গোপ গান গাইলেন। রীতা গাঙ্গুলির পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। এত সুন্দরভাবে কথা বলেন– যেমন ইংরেজি, তেমনি হিন্দি, তেমনি বাংলা। গান গাইছেন আর বেগম আখতারজীকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করছেন। বয়স হয়েছে কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন বেগম আখতারজীর মত করে গাইতে– আমার খুবই ভাল লাগল তাঁর উপস্থাপনা। তারপর প্রিয়াংকা গোপের পরিবেশনা– আধো আধো হিন্দি ও ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলে রাগ পুরিয়া তারপর আখতারজীর গাওয়া গজল, হিন্দি গান, তারপর বাংলা গান গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করলেন। শ্রোতারা খুব মনযোগ দিয়ে প্রিয়াংকার গান উপভোগ করেছেন। সঙ্গে তবলা ও হারমোনিয়াম সবমিলিয়ে আমার খুব ভাল লাগল। তবে আমরা যেভাবে শ্রোতা আশা করেছিলাম সেটা হয়নি। অনুষ্ঠানশেষে রাত ৮.০০টার সময় আমরা একটু সময় পেয়ে দিলিগেটসহ কিছু জায়গায় বেড়াবার সুযোগ পেলাম।

পরের দিন ১২ অক্টোবর রবিবার আমার অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই আমরা মহাব্যস্ত। কী গাইব– আমাদের দলীয় মহড়া চলল। তবলায় সাজিদ ভাই, হারমোনিয়ামে অলোক, আলোচনা করে ঠিক করলাম আমি ৪০মিনিট রাগ পরিবেশন করব, আর অলোক ২০মিনিট গজল ও বেগম আখতারজীর বাংলা গান পরিবেশন করবে। বিকাল ৫.০০টার সময় আমরা পৌঁছে গেলাম আজাদ ভবন অডিটোরিয়ামে, গিয়ে সাউন্ড ব্যালেন্স করে গ্রিন রুমে বসে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। সন্ধ্যা ৬.০০টা অনুষ্ঠান শুরু প্রথমে সুনন্দা শর্মা... উনি শুরুতে বলেই নিয়েছেন গুরুমা গিরিজা দেবীজীর কাছে আমি মানুষ হয়েছি, তাই ওঁর শেখানো কিছু আর আখতারজীর গাওয়া কিছু গাইবার চেষ্টা করব, ঠিক সেভাবেই তিনি পরিবেশনা শেষ করলেন। এবার আমার পরিবেশনা। স্টেজে গিয়ে বসলাম। বুকের ভিতর থরথর করে কাঁপছে। এত গুণীজনের সামনে গান গাইতে হবে আমাকে! সাহস দিচ্ছে সাজিদ ভাই ও অলোক। সাহস করে বাংলাতে ভূমিকা দিয়ে আমার পরিবেশন, আমার ছাত্র অলোকের গজল ও বাংলা গান পরিবেশনের ঘোষণা দিয়ে শুরু করলাম রাগ বেহাগ, বিলম্বিত একতাল ও তিনতাল, পরে রাগ পুরিয়া ধানেশ্রী তিনতাল একটু বিস্তার করে দ্রুত লয়ে তান সারগাম করে আমার পরিবেশন শেষ করলাম। পরে অলোক গজল ও বাংলা গান গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করল। যে ভাবে মজা করে তবলা বাজিয়েছেন সাজিদ হোসেন, অন্যদিকে হারমোনিয়মে অলোক– আমার আর ভয় হয়নি। খুব মেজাজ নিয়ে গাইবার চেষ্টা করেছি শ্রোতাদের যাতে ভাল লাগে। অলোক অনেক ভাল গেয়েছে। সঙ্গে সাজিদ ভাইয়ের তবলা– তুলনা হয় না। শ্রোতারা খুবই ভাল ভাবে আমাদের পরিবেশন উপভোগ করেছেন আইসিসিআরএর কর্মকর্তাসহ অনেকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এবার আমাদের ধন্যবাদ দেবার পালা। ঢাকার ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তন, গুলশানএ আমার প্রথম একক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী মৃদুপবন দাস, শ্রী সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণসহ ভারতীয় দূতাবাসের বেশ ক'জন কর্মকর্তা। অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে তবলায় সৈয়দ সাজিদ হোসেন, হারমোনিয়ামে আলোককুমার সেন সঙ্গত করেছিলেন। সেদিন আমি একটানা এক ঘণ্টা ৪০মিনিট বিভিন্ন রাগ পরিবেশন করেছিলাম। আমাদের পরিবেশনা সবার খুব ভাল লেগেছিল। সেই থেকে আমাদের চেনাজানা। এঁরাই আমাকে ভারতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইবার সুযোগ করে দেন। এঁদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা। আরো ধন্যবাদ জানাই দিলি-আইসিসিআর কর্মকর্তা শ্রী অমিত মাথুরজীকে, তাঁর সবরকম সহযোগিতার জন্য। এছাড়া, ৭ দিন ধরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন আসলাম খান এবং সোমনাথজী, এঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

অনিল কুমার সাহা

অলোক গজল ও বাংলা গান গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করল। যে ভাবে মজা করে তবলা বাজিয়েছেন সাজিদ হোসেন, অন্যদিকে হারমোনিয়মে অলোক– আমার আর ভয় হয়নি। খুব মেজাজ নিয়ে গাইবার চেষ্টা করেছি শ্রোতাদের যাতে ভাল লাগে। অলোক অনেক ভাল গেয়েছে। সঙ্গে সাজিদ ভাইয়ের তবলা– তুলনা হয় না। শ্রোতারা খুবই ভাল ভাবে আমাদের পরিবেশন উপভোগ করেছেন আইসিসিআর-এর কর্মকর্তাসহ অনেকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাণী বন্দনা

প্রাচীন শাস্ত্রে ও মূর্তিতত্ত্বে সরস্বতী

সরস্বতীরানী পাল

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, ব্রাহ্মণগ্রন্থে সরস্বতী বাগ্দেবী। পৌরাণিক যুগে বাগ্দেবী সরস্বতী রীতিমত পূজিত হতে লাগলেন। সরস্বতী বাগীশ্বরী। তাই হিন্দুতান্ত্রিকেরা বাগীশ্বরী নামে সরস্বতীর আরাধনা আর বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা বাগীশ্বরশক্তি বাগীশ্বরীর ভক্ত হয়ে বাগীশ্বরী নামে সরস্বতীর পূজা শুরু করেন। প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রে, সরস্বতীর নানাপ্রকার রূপকল্পনা আছে। কিন্তু সকল রূপেই তিনি মাতৃকামূর্তিতে প্রকটিত। হিন্দুতন্ত্রে ও বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতীর এই ভাবই দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ যে মহাসরস্বতী, ব্রজবীণ্নসর স্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য বজ্রসরস্বতী মূর্তির ধ্যান দিয়েছেন সেগুলিরও মূল মাতৃকামূর্তি। তন্ত্রের নীল্লসর স্বতীও মাতৃকামূর্তি। ইনি দ্বিতীয়া বিদ্যা তারা। তন্ত্রসারে পাওয়া যায় যে ইনি নীলবর্ণা– 'নীলা চ বাক্প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী।' এঁর আরাধনায় সৌভাগ্যলাভ হয়ে থাকে। তন্ত্রে মহানীল সরস্বতীর কথা পাওয়া যায়। তন্ত্রে নীল্লসর স্বতীর এক নাম 'মহাশ্রী'।

মথুরায় শ্বেতাম্বর জৈনদের একটি স্তূপের মধ্যে কয়েকটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরগুলির মধ্যে প্রথম বা দড়িাণ্নপূর্ব দিকের নিকটে ১৮৮৯ সালে বাক্ ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটির আকার ১ ফুট ১০ ইঞ্চি x ১ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি। দেবী জানু উঁচু করে একটি চতুষ্কোণ পাদ্মপী ঠের উপর বসে আছেন। দেবীর বাম হস্তেত্ম একটি পুঁথি। দেবী বস্ত্রপরিহিতা। সরস্বতীর দুই দিকে দুইজন উপাসকের ছোট ছোট মূর্তি।

সরস্বতীর বিভিন্ন মূর্তিরূপ

পদ্মাসীনা: শাস্ত্রানুসারে, সরস্বতী শ্বেতপদ্মবসনা। স্মরণাতীত কাল হতে পদ্ম সকলেরই প্রিয়। আমাদের দেশে লোকে বরাবরই পদ্মকে সকলের চেয়ে সুন্দর ফুল বলে পদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ভারতে সকল যুগেই পদ্ম ছিল অতুলনীয়। এর কদর সকল যুগেই সমান। সাহিত্যের সেবায়, শিল্পকলার অনুশীলনে পদ্মকে কোন দিন কেউ ভোলেনি। প্রাচীনতম বেদে পদ্মের উল্লেখ প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। শ্বেত ও নীল পদ্মের কথা ঋগ্বেদে বহুবার উল্লেখ আছে।

পুণ্ডরীক শ্বেতপদ্ম, পুষ্কর নীলপদ্ম। পরবর্তী যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণ পদ্মকে অপার মাধুর্যময় ও সৌন্দর্যের সার বলে মনে করেছেন। সকল ধর্মই পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল ধর্মের প্রাচীনতম স্থাপত্যনিদর্শনে ভারতের সর্বত্র পদ্ম বিরাজমান। ব্রাহ্মণগ্রন্থে, পদ্মকে আমরা সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির সাথে সংশ্লিষ্ট দেখতে পাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণগণ (১.১.৩.৫ ইত্যাদি) বলেন, প্রথমে সমস্তই জলময় ছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা- সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন। তখনই দেখলেন সরলভাবে একটি "পুষ্করপর্ণ" জলের উপর দণ্ডায়মান রয়েছে। আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পদ্ম আসন ও পাদপীঠরূপেও প্রাচীনতম কাল হতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পদ্মের উপর দেব বা দেবী বসে অথবা দাঁড়িয়ে থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তাঁদের শক্তিত্রয় সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতীর আসন– পদ্ম। অগ্নি, গণেশ, পবন–এঁরাও পদ্মের উপর বসে থাকেন। সূর্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং তাঁর অবতারগণের পাদপীঠ–পদ্ম।

দেবী সরস্বতী সাধারণত পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা বা আসীনা থাকেন। শিল্পশাস্ত্রও এইরূপ নির্দেশ করে থাকেন। শ্বেত পদ্মাসনে সরস্বতীর বসে থাকার নিয়ম। দক্ষিণভারতে গঙ্গৈকো-চোপুরম্, বাগড়ি ও গদগে দ্বিহস্তা এইরূপ পদ্মোপবিষ্টা সরস্বতীর প্রস্তরমূর্তি আছে। স্থাপত্যশিল্পে পদ্মাসনের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উদয়গিরি, ভারহুত ও সাঁচীতে। সাঁচীর মহাস্তূপের দ্বারের উপরেই এই সমস্ত পদ্মাসন খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। সিংহলে শিব, পার্বতী ও কুবেরের পীঠাসন–পদ্ম। তিব্বতে সরস্বতীর পীঠাসনও–পদ্ম। অংশভেদাগম তাঁকে 'শ্বেতপদ্মাসনান্বিতা' এবং পূর্বকারণাগম তাঁকে 'শ্বেতপদ্মাসীনা' বলেছেন।

হংসবাসনা: পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি। তখন তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সংস্কৃত ভাষার জননী। এর বাহন হংস। ব্রহ্মা হংসবাহন; সুতরাং হংসকেও প্রায়ই সরস্বতীর বাহনরূপে দেখতে পাওয়া যায়। মানস্লস রোবরের হংসও চিরপ্রসিদ্ধ। কালিদাসের মেঘদূত হতে আরম্ভ করে বর্তমান কবিদের রচনায় মানস্লস রোবরে হংস স্থান পেয়েছে। পুরাণাদিতে নির্দেশ আছে, সরস্বতী মানস্লস রোবর হতে উৎপন্না। তাই হংসের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক ঘটা বিচিত্র নয়।

ময়ূরবাহনা: দক্ষিণ ভারতে বোম্বাই প্রদেশে সরস্বতী সাধারণত ময়ূরবাহনা। মূরের (Moore) গ্রন্থে (Moore's Hindu Pantheon) চতুর্হস্তা ময়ূরবাহনা সরস্বতীর ছবি আছে। রাজপুতানায়ও ময়ূরবাহনা সরস্বতী আছে। ক্যানিংহামের মতে, গঙ্গায় মকরের প্রাচুর্য, যমুনায় কচ্ছপের এবং সরস্বতীর তীরে ময়ূরের আধিক্যহেতু এইরূপ বাহন হয়ে থাকে।

মেষবাহনা: বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের চিত্রশালায় একটি আসীনা সরস্বতী আছেন। ইনি মহাম্বুজরূপী ঠে 'সুখাসন'মুদ্রায় বসে আছেন। পাদপীঠে একটি মেষ আছে। দেবী মেষের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণপাদ রেখেছেন। দেবীর চার হস্ত। উপরের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা; উপরের বাম হস্তে–পুস্তক; নীচের দুইটি হাতে দেবী বীণা ধারণ করে আছেন।

সিংহবাহনা: সিংহবাহনা সরস্বতী বৌদ্ধ সরস্বতী। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী। মঞ্জুশ্রীর বাহন সিংহ; সুতরাং তাঁর শক্তি সরস্বতীর বাহনও সিংহ হয়েছে। কলকাতার প্রত্নশালায়ও একটি সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি আছে। দেবীর দুই হস্তে পরশু ও গদা। অপর দুই হস্তে তিনি দানবের জিহ্বা উৎপাটন করছেন। এই বাগীশ্বরী মূর্তিটি মগধে আবিষ্কৃত এবং দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত।

সরস্বতী মূর্তির ভঙ্গী

বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে অনেক সময় সরস্বতীকে দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চিত্রশালায় এইরূপ অনেকগুলি মূর্তি আছে। সরস্বতীমূর্তির ভঙ্গী সাধারণত সমভঙ্গ। পরিষদের চিত্রশালায় 'সমপদস্থানক' মুদ্রায় পদ্মপীঠে দণ্ডায়মানা একটি বিষ্ণুমূর্তি আছে। ঐ মূর্তির দণিপার্শ্বে লক্ষ্মী, বামপার্শ্বে বীণাহস্তে সরস্বতী; উভয় স্ত্রীমূর্তিই ত্রিভঙ্গ। ত্রিভঙ্গমুদ্রায় এক পা বাড়িয়ে দেবী দ-ায়মানা। পরিষদে দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় একটি বীণাহস্তা সরস্বতী আছেন।

ভারতের এলাহাবাদের নিকট ভিটায় অনেকগুলি (seal) মোহরকরা

পূজার দিনে বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুলের খুব ব্যবহার ছিল। পূজার দিন হতে শাল, দোশালা, রুমাল বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ছেড়ে সাদা বা বাসন্তী রঙের উড়ানী প্রভৃতি গ্রীষ্মকালোপযোগী বস্ত্র ব্যবহার শুরু করতেন অনেকে।

মুদ্রা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একটি গোলাকৃতি সীলের একদিকে উপরিভাগে পাদপীঠে একটি কুম্ভ; পাদপীঠের নীচে উত্তরদক্ষিণে ছাপ দিয়ে আঁকা সরস্বতী; সীলের অপর দিকে কিছু নাই। সীলটির ব্যাস আধ ইঞ্চি।

ঢাকা চিত্রশালায় সমাচারল দেবের দুইটি মুদ্রা সংরক্ষিত আছে। তারমধ্যে একটি মুদ্রার পশ্চাদ্ ভাগে সরস্বতীমূর্তি আছে। দেবী পদ্মের উপরে ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছেন। দেবীর দুষ্টি দক্ষিণ দিকে; দেবীর বাম হস্ত একটি সনাল পদ্মের উপরে রত। দেবী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অপর একটি পদ্ম মুখের দিকে টেনে আনছেন। দক্ষিণ হস্তের কণুইএর নী চে একটি পদ্মনালের উপর পদ্মের কুঁড়ি। আর এর নিম্নে একটি উন্নীতগ্রীব হংস।

হিন্দুশাস্ত্রে দেবী সরস্বতী জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সরস্বতীর যে কয়েক রকমের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে সরস্বতীর হস্ত সংখ্যায় দুই বা চার। সাধারণত দুই হাত থাকলে দেখা যায়, এক হাতে পুস্তক, অপর হাতে মালা। ব্রহ্মবৈর্বত (ব্রহ্মখ-, ৩ অধ্যায়) বলেন, 'বীণাপুস্তধারিণী'। সরস্বতীর চার হাত হলে অপর দুই হাতে পাশ ও অঙ্কুশ, অথবা বীণা ও কমণ্ডলু থাকবে। সরস্বতীর কর্ণে কুণ্ডল থাকে। পূর্বকারণাগম বলেন, তাঁর কর্ণকুণ্ডল মুক্তার– 'মুক্তাক-লমণ্ডিতাম্; কিন্তু অংশুভেদাগমম তে সরস্বতীর কুণ্ডল রত্নখচিত– 'রত্নকু-লমণ্ডিতা'। স্কন্দ পুরাণের সূতসংহিতায় সরস্বতীর মস্তকে জটামুকুট। এই মুকুটে চন্দ্রকলা সন্নিবিষ্ট। দেবী যজ্ঞোপবীতধারিণী, হারমু ক্তভরণভূষিতা। সমস্ত মূর্তিতেই দেবী ত্রিনেত্রা। তাঁর মস্তকের চারিদিকে প্রভাম-ল।

হিন্দুশাস্ত্রে, গড়ামূর্তির পূজার প্রচলন খুব একটা ছিল না। টোলের অধ্যাপক ও পাঠশালার অধিকারী পণ্ডিতগণই শুধু প্রতিমা গড়ে পূজা করতেন। দেবী সরস্বতীর পূজা হত দুই রকমে– এক দেবীর মৃন্ময় প্রতিমা গড়ে, আর, মূর্তি না রেখে–বই, মাটির দোয়াত, শরের কলম, কাগজ ও অন্যান্য সারস্বত প্রতিনিধি সম্মুখে রেখে পূজা করা হত। পূজায় শ্বেত উপচারের ব্যবস্থা। সাদা চন্দন, সাদা ধান, সাদা ফুল। খোয়াক্ষীর, মাখন, দই, খৈ, তিলেখাজা, কুল– এগুলিও সাদা। দেবী নিজে শ্বেতবর্ণাতাঁর বীণা শুভ্র, হস্ত শুভ্র, চু বস্ত্রালঙ্কার শুভ্র, পদ্ম শুভ্র। দেবীর পূজায় কাঞ্চন ফুল, আম্রমুকুল ও অভ্রও দেওয়া হয়। পূজার দিনে বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুলের খুব ব্যবহার ছিল। পূজার দিন হতে শাল, দোশালা, রুমাল বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ছেড়ে সাদা বা বাসন্তী রঙের উড়ানী প্রভৃতি গ্রীষ্মকালোপযোগী বস্ত্র ব্যবহার শুরু করতেন অনেকে।

পূজা উপলক্ষে বন্ধুবান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিমাদর্শনের নিমন্ত্রণ জানানো হত। পূজার পূর্বে 'জলসওয়া'র একটা মধুর ব্যাপার ছিল। পূজার দিন মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ– ফলাহারই বিধি। পূর্ববঙ্গে এবং অন্য কয়েকটি জায়গায়, বিজয়ার পর হতে শ্রীপঞ্চমীর আগের দিন পর্যন্ত ইলিশ মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। বোধ হয়, এটি পরোক্ষভাবে জীবরক্ষার আইন।

সত্তরআশী বৎসর পূর্বে কলকাতার গণিকাদের বাড়িতে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সরস্বতীপূজার আয়োজন হত। আর পূজার আয়োজনে বেজায় ধুম হত। বিহারে নর্তকীরা বেশ্লবিন্যাস করে বসন্তপঞ্চমীর দিন গাড়ি চড়ে আমীর ওমরাহ্দের বাড়িবাড়ি 'পুস্কার' (পুরস্কারভিক্ষা) আদায় করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, এই দিন ভাল রোজগার হলে বছর ভাল যাবে। ছোটনাগপুরে বসন্তপঞ্চমীর দিন পূজা হয়, পূজা উপলক্ষে নাচগান হয়। উৎসব কে কেন্দ্র করে মেলাও বসে। মেলার নাম 'দেও'। মেলায় হাতি, ঘোড়া, গরুর দৌড় হয়; পালওয়ানদের কুস্তি হয়।

সরস্বতীরানী পাল

ছোটগল্প

বার্গামট বাগানের বিকেলের গল্প

ঝর্না রহমান

একটি দুঃসহ বাসযাত্রায় চরম ভোগান্তির ছয় ঘণ্টা পর চূড়ান্ত অনিশ্চিত মুহূর্তের ভেতর থেকে এমন একটি বিস্ময় জন্ম নেবে তা ভাবতেও পারেননি জেবুন্নেসা খানম। তিনি স্থানকালপাত্র আর নিজের সাত দশক পেরিয়ে আসা বয়সের কথা ভুলে প্রশ্নকর্তা বৃদ্ধের মুখের দিকে অবাক তাকিয়ে থাকেন। বৃদ্ধজনের চোখেও চাপা কৌতূহল। তবে সেই সঙ্গে তাঁর ঠোঁটে একটা ছোট্ট হাসির হামিং পাখি যেন স্থির উড়ালে চঞ্চল।

তাঁর মুখ শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত। হালকা কাশফুল চুল নদীর হাওয়ায় উড়ছে। গায়ে লিনেনের একটি রঙদার হাওয়াই শার্ট। পক্বকেশ বৃদ্ধের একটু কুঁজো হয়ে যাওয়া দেহে জামাটি যৌবনের ধ্বজার মত নেচে উঠছে যেন। এই নদী, এই দুরন্ত বাতাস, এই অনিশ্চিত জনপদের কুহেলিঢাকা ভোরের প্রেক্ষাপটে বৃদ্ধজনকে আবিষ্কারের এই বিশেষ মুহূর্তটিতে জেবুন্নেসা খানমের কাছে তাই মনে হলো। নিজের অজান্তেই জেবুন্নেসা তাঁর সাদা শাড়ি মোড়ানো দেহটিকে এক নজর পরখ করেন। তিনি তো বাইশ বছর বয়স থেকেই যৌবনকে ঢেকে রেখেছেন শ্বেত পতাকায়। তিনি যখন পঞ্চাশ তখন স্বামী খবিরুল ইসলামের মৃত্যু হলে তাই তাঁকে আর নতুন করে বিধবার নিশান অঙ্গে ধারণ করতে হয়নি।

'আপনি জেবু মানে জেবুন্নেসা ম্যাডাম না?' সামনে দাঁড়ানো বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত আগে এ প্রশ্ন করে জেবুন্নেসার চোখের বহুদিনের বন্ধ জানালার পাল্লা দুটো যেন এক ধাক্কায় খুলে দিয়েছেন। একটু আগেই মনে হচ্ছিল দুর্ভাগ্য যেন আজ শুধু জেবুন্নেসাকেই নয়, এসএল পরিবহনের এই ৫৫০ নম্বর গাড়িটির বেয়াল্লিশজন যাত্রীকেই এক দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, যেন একটি অনন্ত সমস্যাসংকুল যাত্রাপথে নেমেছে কয়েকজন মানুষ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই দুর্দশাটা যেন জেবুন্নেসার জন্য একটা শুভযোগ হয়ে এসেছে।

শুধু দুটো জিনিস বর্জন করেছেন– চোখে সরু কাজলের টান আর কানে গলায় হালকা স্বর্ণালংকার। বিধবা বউয়ের কাজলটানা চোখে সুঁচ ফোটাবার জন্য অসংখ্য ক্রুর চোখ তো চারপাশেই থাকে! তাই অলংকারেও কেমন বিতৃষ্ণা জন্মে গেল জেবুন্নেসার!

অবশ্য আর একটি জিনিসও তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে, তবে তার সাথে বৈধব্য বা বিতৃষ্ণা এ ধরনের কোন বিষয় জড়িত ছিল না। বয়সের সাথে সাথে তাঁর ঠাণ্ডার ধাতটা বেড়ে যাবার কারণেই তা করতে হয়েছিল। তা হলো তাঁর কোমর ছাপানো লম্বা চুলের বোঝা ছেটে ঘাড় তক করে ফেলা। ওই চুল একদিন ভিজলে দুদিন লেগে যেত শুকোতে। মাথা ভার হয়ে থাকা সর্দি কাশি বুকে হাঁপ এসবের সাথে জেবুন্নেসার লম্বা চুলের বদনামীটাই লেগে গেল। স্পনডাইলোসিসের ব্যথার কারণে চুল আঁচড়ানোও এক ঝকমারি। হাতের গোড়া আর ঘাড় যেতো ব্যথা হয়ে। তাই একদিন চুল কাটা দোকানে গিয়ে একেবারে বয়কাট করে এলেন তিনি। ছাঁটা চুলের ব্যাট্টা মাথা নিয়ে জেবুন্নেসা দশ বছর ধরে মহা শান্তিতে আছেন। তাঁর চুলও আশিভাগই সাদা। খানিকটা কালো থাকার কারণে জেবুন্নেসার মাথায় একটা ধূসরাভ রূপালি জেল্লা। সেই জেল্লা এখন তাঁর চোখেমুখেও। ভারি কাচের চশমার পেছনে জেবুন্নেসা চোখের ভেতরে চল্লিশ বছর আগেকার বেতফল মনি দুটোয় লুকোনো আলো ঝিলিক দেয়। 'আপনি জেবু মানে জেবুন্নেসা ম্যাডাম না?' সামনে দাঁড়ানো বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত আগে এ প্রশ্ন করে জেবুন্নেসার চোখের বহুদিনের বন্ধ জানালার পাল্লা দুটো যেন এক ধাক্কায় খুলে দিয়েছেন।

একটু আগেই মনে হচ্ছিল দুর্ভাগ্য যেন আজ শুধু জেবুন্নেসাকেই নয়, এসএল পরিবহনের এই ৫৫০ নম্বর গাড়িটির বেয়াল্লিশজন যাত্রীকেই এক দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, যেন একটি অনন্ত সমস্যাসংকুল যাত্রাপথে নেমেছে কয়েকজন মানুষ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই দুর্দশাটা যেন জেবুন্নেসার জন্য একটা শুভযোগ হয়ে এসেছে।

গত রাত এগারোটায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসবার পর দীর্ঘ চার ঘণ্টা পণ্যবাহী ট্রাকের জ্যামে আটকে থেকে তাঁদের বাসটা যখন আরিচা ফেরিঘাটে পৌঁছল তখন ভোর পাঁচটা। হালকা শীত পড়তে শুরু করেছে। বাসের জানালার কাচগুলো কুয়াশায় ঢাকা। নিরুপায় যাত্রীসকলের বসে বসে প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তবে তাঁদের বেশিরভাগই সিট এলিয়ে গায়ে ব্লাঙ্কেট টেনে দিয়ে ঘুমিয়েছেন। জেবুন্নেসা কোনোদিনই যাত্রাপথে ঘুমাতে পারেন না। তা ছাড়া তাঁর পাশের সিটে বসা মহিলার কোলের তিনচার বছরের বাচ্চাটি সারাক্ষণই ছিল অস্থির। কাজেই ঘুমোনোর জন্য জেবুন্নেসার একটু চেষ্টা করারও উপায় ছিল না। তাঁকে বরঞ্চ সারাক্ষণই বাচ্চাটিকে নানারকম কথার ছলে শান্ত করার কসরৎ করতে হয়েছে। মনে মনে ভেবেছেন, এর চেয়ে কোন পুরুষ যাত্রীর পাশে বস্লা ই ভাল ছিল। জেবুন্নেসার ছেলে কামরুল টিকেট কেটে এনে মাকে বলেছিল, একটু ম্যানেজ করে একজন মহিলার পাশের সিটটি নিয়েছি। জেবুন্নেসা মনে মনে হেসেছেন। এই বয়সে একজন অপরিচিত পুরুষ যাত্রীর পাশে বসে জার্নি করলে তাঁর ক্লি ই বা সমস্যা হবে! যৌবনেও কি হত! বাইশ বছর বয়সেই তো তিনি স্বামীর একটি কথায় নিজের সোনালি যৌবনের ছটাকে চিরকালের জন্য সাদা শাড়ির দেয়ালে আটকে ফেলেছিলেন! তখন থেকেই কি কঠিন ব্যক্তিত্বের খোলসে ঢেকে নেননি নিজেকে?

বাসটা এতক্ষণে বহুদূর চলে যেত। কিন্তু ফেরিটি ঘাটে লাগার পর পন্টুন পেরিয়ে কাঁচা মাটিতে নামা মাত্রই বাসের পেছনের বাম্পারসহ এক চাকা ঢুকে গেল মাটির তলায়। এখন এটা খন্তা কোদাল্ল গাঁইত্তি শাবল দিয়ে খুঁড়ে তুলতে কমসে কম এক ঘণ্টা লাগবে। দীর্ঘ চার ঘণ্টা জ্যামে আটকে থাকার পর এখন আবার এই নতুন বিপত্তিতে বিরক্তি আর হতাশায় যাত্রীরা মুষড়ে পড়েছেন। পুরুষদের অনেকেই নেমে গিয়ে এদিক সেদিক জলবিয়োগের আড়ালটাড়ালের খোঁজ করছিলেন। মহিলারা যদিও সর্বংসহা। তবে তাঁদেরও কয়েকজনকে দেখা যায় রাস্তার পারে একটা বেড্ডা ঘেরা বাড়িতে ঢুকে যেতে। জেবুন্নেসাও নেমে যান। তবে তিনি নামেন একটু চায়ের খোঁজে। একটু গরম চায়ের জন্য প্রাণটা আইঢাই করছে। কিন্তু এই কুয়াশামোড়া ভোরে কোথায় পাওয়া যাবে চা? আশেপাশে কোন দোকান বা চা ওয়ালা চোখে পড়ে না। এখনও ভাল করে আলোই ফোটেনি। হোটেলটোটেল সব যেন সুবহে সাদেকের গিলাফ গায়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সামনে একজন বৃদ্ধকে দেখে জেবুন্নেসা জিজ্ঞেস করেন– আপনি তো আমাদের গাড়িতেই...?

বৃদ্ধ সামান্য মাথা নেড়ে হতাশ চোখে বাসের দেবে যাওয়া পশ্চাদ্দেশের দিকে চেয়ে থাকেন।

– আচ্ছা এখানে চা পাওয়া যাবে না কি? কি ঝামেলা হল বলেন তো!

বৃদ্ধ ঘুরে দাঁড়িয়ে জেবুন্নেসাকে দেখে একমুহূর্ত ভাবেন,

– আপনি জেবু, মানে জেবুন্নেসা ম্যাডাম না?

জেবুন্নেসার চোখে জিজ্ঞাসা। বৃদ্ধের চোখে যেন একটু কৌতুক ঝলকায়।

– আমি হুমায়ুন।

– হুমায়ুন? কোন হুমায়ুন? জেবুন্নেসা চোখ কুঁচকে বৃদ্ধের চেহারা চেনার চেষ্টা করেন।

– আজাদ হুমায়ুন। খুলনায় বিএল কলেজে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। ভুলে গেছেন?

হুমায়ুনের জিভের কোথাও একটু জড়তা। তাতে মনে হয় কথাগুলো পানির তলা থেকে ভেসে আসছে।

– আর সেই আর্ল গ্রে চা? মনে নেই?

আর্ল গ্রে চা? থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন জেবুন্নেসা।

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের বাসট্রাক গাড়িঘোড়ার গগনবিদারী হর্নের শব্দ, মানুষের কোলাহল, হই চই চেঁচামেচি, ধুলোবালি নোংরা আবর্জনা, দুর্গন্ধভরা দুঃসহ পরিবেশে ভাঙাচোরা কাঁচা মাটির রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন সত্তরোর্ধ্ব জেবুন্নেসা খানম এক অদ্ভুত সুরভিত চায়ের নীলাভ ধোঁয়ার ভেতর থেকে সংগোপনে টেনে নেন স্মৃতির সুবাস। তাঁর ফুলে ওঠা টনসিলের তলায় আঠালো রস ঠেলে নিঃসৃত হয় এক ফোঁটা গোলাপের নির্যাস। কোন অদেখা নারাঙ্গী বন থেকে একটি ধুমায়িত সোনালি কাপ হাতে যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন হুমায়ুন।

জেবুন্নেসা চশমার কাচের ভেতর দিয়ে নিরীখ করেন শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের

চোখের পাতা ভারি হয়ে নেমে এসেছে চোখের ওপর। তার ওপর নেতিয়ে আছে পাকা ভুরু। চোখের কোলে দুটো বেলুন। কোথায় হুমায়ুনের সেই দীপ্তিভরা চোখ– হালকা ঢেউ খেলানো ঘন চুলে ঢাকা ছোট কপালের তলায় বাঙময় দুটি চোখের চাউনি– যা জেবুন্নেসার একটি শিহরিত অপরাহ্নের স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে! চল্লিশ বছর আগের ধারালো ঝকমকে সেই যুবকটিকে এই বার্ধক্যের সাদা ব্রাশ টানা ছবির সাথে জেবুন্নেসা একেবারেই মেলাতে পারেন না।

মানুষটিকে। আজাদ হুমায়ুন! তাঁর চল্লিশ বছর আগেকার সহকর্মী। বছরতিনেক চাকরি করেছিলেন হুমায়ুন বিএল কলেজে। ইংরেজি পড়াতেন। সুন্দর উচ্চারণ আর নলেজেবল টিচার হিসেবে অল্পদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন হুমায়ুন। বাংলার প্রতিও তাঁর অনেক আগ্রহ। রতন চিনে নেয় রতনকে। প্রায়ই কোন বাংলা শব্দের উৎস, বাচ্যার্থ, বাগধারা প্রবাদপ্রবচন ইত্যাদি জানতে আসতেন বাংলার প্রভাষক জেবুন্নেসা খানমের কাছে। সখ্য গড়ে ওঠে সহজেই। শব্দ নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠতেন দু'জন।

হুমায়ুন বলতেন, বাংলার যত ঝামেলা যুক্তবর্ণ নিয়ে। ইংরেজিটা দেখেন। কী সিম্পল! জেবুন্নেসা বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যগুলো ছড়িয়ে দিতেন হুমায়ুনের চোখের সামনে। কত বৈজ্ঞানিক, সুবিন্যস্ত, সুপরিকল্পিত আর ছন্দোবদ্ধ এই ভাষা! কত শব্দ? শব্দের একটা খনি যেন! যত খুঁড়বেন তত শব্দ বেরিয়ে আসবে।

মাঝে মাঝে হুমায়ুন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতেন জেবুন্নেসার মুখের দিকে। বলতেন, আপনিই একটা খনি! সোনার বাংলা খনি! হুমায়ুনের মুগ্ধতা জেবুন্নেসাকে গোপনে আবিষ্ট করত। তবে কৌতুক ছলে সেই মুগ্ধতাকে সহজ করে তুলতেন।

–সোনার বাংলা খনি থেকে আপনার জন্য আপাতত দুটো তামার শব্দ উত্তোলন করা হল। তাম্রচূড় আর তাম্রকূট শব্দ দুটোর কোনটার মানে কী?

হুমায়ুন মানে খুঁজতে গিয়ে গলদঘর্ম।

একবার হুমায়ুন একটি শব্দ নিয়ে জেবুন্নেসার কাছে এলেন। 'নিষ্ঠীবন' মানে কী ধরনের বন?

হেসে গড়িয়ে পড়েন জেবুন্নেসা। নিষ্ঠীবন কোন বনজঙ্গল নয়। নিষ্ঠীবন মানে হলো থুতু।

হুমায়ুন একটু অপ্রস্তুত। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলেন,

– ও মাই গড! এমন সুন্দর শব্দের এমন ন্যাস্টি মানে! দেন উই ক্যান সে, যেখানে সেখানে নিষ্ঠিবন ফেলিও না।

– উঁহু, তা হলে গুরুচণ্ডালি হবে। বলতে হবে– যত্রতত্র নিষ্ঠীবন নিক্ষোপ করিও না। শব্দের কৌলীন্য আছে জানেন তো! গুরুতে চণ্ডালে তাই পাশাপাশি বসতে পারে না।

হুমায়ুন হেসে বলেছিলেন, গুরুশিষ্য পাশাপাশি বসতে পারলেই হল।

হুমায়ুন আর জেবুন্নেসা ফেরিঘাটের উঁচুনিচু কাঁচা মাটির ধুলোভরা রাস্তা পেরিয়ে ওপরের দিকে উঠে আসেন।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে চলে এলেন ওঁরা। একটা বাবলা গাছের তলায় ছোট দোকানের ঝাঁপ তুলছে কেউ। বললে নিশ্চয়ই চা বানিয়ে দেবে। কাছে যেতে দেখা গেল ওটা একটা মনোহারি দোকান। চা নেই।

হুমায়ুন পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক থেকে গড়িয়ে পড়া তরল পানি মুছতে মুছতে বলেন, এখনও লোকজনের ঘুম ভাঙেনি। একটু পরেই দেখবেন চা সিঙাড়া পাউরুটি বিসকুট সেদ্ধ ডিম এসব নিয়ে হকারদের চেঁচামেচি শুরু হয়ে যাবে।

জেবুন্নেসা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলেন, চলেন, ফিরে যাই। আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে। হিম পড়ছে।

–আপনারও তো লাগছে। আপনার তো ঠাণ্ডা বেশি লাগে। বলতেন চুল কেটে ফেলবেন। গোসল করলে চুল শুকায় না। এখন তো দেখছি সত্যিই চুলটুল কেটে এ পি জে আবদুল কালাম হয়ে গিয়েছেন!

জেবুন্নেসা হাসেন।

– কাজী নজরুলকে বাদ দিয়ে তুলনা করলেন আবুল পাকির জয়নুলাবেদিন আবদুল কালামের সাথে?

– নজরুলের বাবরি ছিল কালো। আর বেশি বয়সে তাঁর মাথায় চুলই ছিল না। কিন্তু ইন্ডিয়ার ইলেভেন্থ প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালামের চুল ঠিক আপনার মতো জেল্লাদার ধূসর সাদা। ঘন। ঘাড়ছোঁয়া। সিঁথির দুপাশ দিয়ে ছন্দে ছন্দে গুচ্ছ গুচ্ছ নেমে এসেছে।

– ও বাবা, আপনি আমার পাকা চুলের বাবরিদোলানো মহান মস্তকটাকে তো ভালই লক্ষ্য করেছেন দেখছি! সাংঘাতিক নজর তো আপনার!

– কই আর সাংঘাতিক! নইলে গত পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধরে আমি আর আপনি একই বাসের যাত্রী হয়ে একই গন্তব্যের দিকে যাচ্ছি অথচ আপনাকে আমি দেখতেই পেলাম না।

– সত্যিই আশ্চর্য । আমারও চোখে পড়ল না আপনাকে! আসলে আমরা বাসে উঠে যে যার সিটে বসে পড়েছি, তারপর তো আর রাতের বেলা বেরুবার প্রয়োজন হয় নি! ভাগ্যিস এখন নেমেছিলাম, তাই দেখা হয়ে গেল!

– আপনি তো আমাকে চিনতেই পারছিলেন না। খুব বদলে গেছি তাই না? অবশ্য না চেনারই কথা। বুড়ো তো হয়েছিই। আয়্যাম রানিং সেভেনটি সেভেন! ইটস নট এ ম্যাটার অব জোক! দাঁত পড়েছে দু'পাটিতে কয়েকটা। গল বস্নাডার এপেন্ডিক্স টনসিল এসব বহু আগেই কোরবানী হয়ে গিয়েছে। তার ওপর কয়েক বছর আগে টু থাউজ্যান্ড টেন্ন এ একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গেল। তাতে মুখটা গেল বেঁকে। তবে আমি বাঁকিনি!

শরীরে একটা ঝাঁকুনি তুলে হাসিমুখে বুক টান করে দাঁড়ান হুমায়ুন।

জেবুন্নেসা ভোরের হালকা কুয়াশামাখা আলোয় আবার হুমায়ুনের মুখের ওপর এক ঝলক নজর করেন। শ্বেতশুভ্র মাথা। চুল কমে গিয়েছে। মুখ ঢাকা দাড়ি গোঁফও প্রায় সবই সাদা। মুখটা একদিকে একটু বেঁকে আছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে নেমে এসেছে চোখের ওপর। তার ওপর নেতিয়ে আছে পাকা ভুরু। চোখের কোলে দুটো বেলুন। কোথায় হুমায়ুনের সেই দীপ্তিভরা চোখ– হালকা ঢেউ খেলানো ঘন চুলে ঢাকা ছোট কপালের তলায় বাঙময় দুটি চোখের চাউনি– যা জেবুন্নেসার একটি শিহরিত অপরাহ্নের স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে! চল্লিশ বছর আগের ধারালো ঝকমকে সেই যুবকটিকে এই বার্ধক্যের সাদা ব্রাশ টানা ছবির সাথে জেবুন্নেসা একেবারেই মেলাতে পারেন না। শুধু মেলে তাঁর কণ্ঠস্বরটি। মাদকতাময়, মৃদু তরঙ্গিত।

– দাড়ি মানুষের চেহারা বদলে দেয়। জেবুন্নেসা ঠাট্টার সুরে বলেন। দেখেন না, কেউ ছদ্মবেশ নিতে চাইলে সবার আগে দাড়ি রাখে!

হুমায়ুন দাড়িতে হাত বোলান।

– হুম, ছদ্মবেশই বটে। বছর দশেক আগে এক গালকাটা হিরোঞ্চি রাতের বেলা গলির মুখে একা পেয়ে তার ক্ষুরটা আমার গালে তিন ইঞ্চি টেনে দিয়ে তারপরে ধীরেসুস্থে মানিব্যাগ ঘড়ি মোবাইল এসব তুলে নিল। সেলাইটা আর মিশল না। পরে লোকে না আবার আমাকে 'গালকাটা হুমায়ুন' তকমা লাগিয়ে দেয়, তাই...তা ছাড়া মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি, নানা হয়েছি সেই কবে। বড় নাতনিটিরও বিয়ে হয়েছে। কদিন আগে তার কোলে এক পুতনিও এসেছে। দাড়ি না রাখলে কি মানায়? শব্দ করে হেসে ওঠেন হুমায়ুন।

কয়েকজন হিজাব পরা মহিলা তাদের পাশ দিয়ে নদীর দিকে চলে যান। সেদিকে তাকিয়ে হুমায়ুন বলেন, তবে একটা কথা ঠিক, আপনি যদি এরকম হিজাবটিজাব পরতেন তাহলে আপনাকেও আমি চিনতে পারতাম না। হিজাবও

মহিলাদের চেহারা পালটে দেয়। আর আজকাল তো হিজাব ছাড়া মহিলা দেখাই যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় এটা বুঝি বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান।

জেবুন্নেসা মাত্র ক'দিন আগেই ব্যাংকে দেখা হয়ে যাওয়া তাঁর এক পুরোনো ছাত্রীর কথা ভাবেন। হিজাব পরা এক মহিলা এসে তাঁকে ম্যাডাম সম্বোধন করে সালাম জানানোর পরে তিনি সহজ ভাবেই উত্তর দিয়ে বসে থাকেন। শিক্ষকতা পেশায় থাকলে যেখানে সেখানে ছাত্রছাত্রীর সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নামপরিচয় মনে থাকে না। কিন্তু মহিলা কাছে এসে যখন বললো, ম্যাডাম আমি কামরুন নাহার। নাটক করতাম।

– কামরুন নাহার? এ কী!

জেবুন্নেসা প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। দারুণ চৌকস, সাহসী, প্রতিবাদী এই মেয়েটিকে জেবুন্নেসা অন্য চোখে দেখতেন। সাইকেল চালিয়ে কলেজে আসত। সংগঠন করত। একদিন কলেজে ঢোকার মুখে এক ইভটিজারকে জুতোপেটা করেছিল। ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীনও কামরুন কয়েকবার দেখা করেছে জেবুন্নেসার সাথে। নাট্য প্রদর্শনীর কার্ড দিতে এসেছে। লেখা চাইতে এসেছে। জিনস আর ফতুয়া পরা কামরুনকে তখন মনে হত আরও ধারাল, জ্বলজ্বলে। সেই কামরুন! কামরন্নন নিজে পরিচয় না দিলে চোখের সামনে সারাদিন ওঠাবসা করলেও জেবুন্নেসা তাকে চিনতে পারতেন না। কামরুন একটু বিব্রত ভঙ্গিতে হেসে বলেছে, বিয়ের পরে মনটা বদলে গেল ম্যাডাম। মনের ওপর তো হাত নেই!

তা ঠিক, মনের ওপর হাত নেই। যেমন এখন জেবুন্নেসার মনের ওপর হাত নেই। প্রায় তিন যুগ পরে দেখা হয়ে যাওয়া সহকর্মীর সাথে তিনি দিব্যি সুদূরের হাইওয়েতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গল্প করছেন। বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছেন হাসির স্বর। মনে হচ্ছে এর মধ্যে বাসটা ঠিক হয়ে তাঁদের ফেলে চলে গেলেও যেন ক্ষতি নেই।

জেবুন্নেসা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন, এত বছর পরে দেখা হওয়ার পর যে জিনিসটা স্বাভাবিক ছিল, তাঁদের বর্তমান অবস্থা আর অবস্থান জানা, কে কোথায় থাকেন, কী করেন, পারিবারিক অবস্থা কী, কোথায় উঠবেন, কেন যাচ্ছেন– আরও কত জানার বিষয়– যা মানুষের প্রতি মুহূর্তের দিনযাপনের সাথে লগ্ন থাকে, যা 'পরিচয়' হিসেবে একজন মানুষকে নির্মাণ করতে থাকে। তাঁরা কি তবে একটা অদৃশ্য সেতুর ওপর দিয়ে একসাথে অনেকদিন আগে পেরিয়ে এসেছেন অনেকটা পথ! হঠাৎ মনে হয়, কুয়াশামোড়া ফেরিঘাটে দু'জনকে আবিষ্কার করার পর থেকে তাঁরা মূলত সেই যুগল হাঁটাটিই হাঁটছেন। সেই চল্লিশ বছর আগের এক বর্তমানকেই বয়ে চলেছেন। মাঝখানে যেন কোনো অদেখা সময়ের হিসাব নেই।

জেবুন্নেসা সাবধানে অদেখা সময় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন।

–খুলনার টুটপাড়ায় আমার ছোট ছেলেটি থাকে। ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। টাইফয়েড। নাতনিটিরও সামনে এসএসসি পরীক্ষা। বউমা একটা এনজিওতে চাকরি করে। ও একা সব দিক সামলাতে পারছে না। আমি কটা দিন ওদের কাছে থাকতে যাচ্ছি। নাতনিকেও একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। রিটায়ার করলে কী হবে, মাস্টারিটা ছাড়িনি!

–আপনার সঙ্গে কেউ নেই? মানে, এতটা পথ একা...

কে থাকবে! বড় ছেলেটা ডাক্তার। হাসপাতাল আর চেম্বার করে তার কোন সময় থাকে না। তা ছাড়া জেবুন্নেসা তো নিজেকে অথর্ব ভাবেন না। তিনি একাই চলেন। ছেলে গিয়ে বাসের টিকিট কেটে এনেছে। এটারও দরকার ছিল না। তিনি কলাবাগান গিয়ে দিব্যি টিকিট করে আনতে পারতেন।

আর হুমায়ুন? হুমায়ুন যাচ্ছেন সেই বিএল কলেজেই বাংলাদেশের বনাঞ্চল নিয়ে তিনদিনের একটা সেমিনারে যোগ দিতে। কয়েক বছর ধরে তিনি 'গ্রিন হরাইজন' নামে একটি এনভাইরনমেন্ট ডেভেলপিং প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত আছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁরা সেমিনার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করে বেড়ান। জেবুন্নেসা কি যাবেন তাঁর পুরোনো কর্মস্থলের এই সেমিনারে? গেলে চেনাপরিচিত কাউকে পেয়ে যেতে পারেন! নস্টালজিয়ায়ও পেয়ে বসতে পারে! জেবুন্নেসার শরীর ঘিরে স্মৃতির বাতাসের ঝাপটা। বলেন, দেখি, ছেলের বাসায় গিয়ে জনয়িত্রী আর শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব পালন করে সময় পাই কি না।

চা পাওয়া না গেলেও ফেরিঘাটের লোকজনের সহায়তায় আধ্ব ঘণ্টার মধ্যেই রেলের বগির মত হিনো কোম্পানির বিরাট লম্বা বাসটির চাকা আর বাম্পার মাটি খুঁড়ে বের করে আনা হয়।

বাসে উঠে জেবুন্নেসা দেখেন তাঁদের দু'জনের সিটের মাঝখানে মাত্র তিন সারির ব্যবধান। জেবুন্নেসার ২৬, হুমায়ুনের ৩৩। জেবুন্নেসা ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে তাকিয়ে দু'একবার হুমায়ুনকে দেখেন। জেবুন্নেসাকে দেখার জন্য পেছনে বসা হুমায়ুনের ঘাড় ঘোরাবার দরকার পড়ে না। হুমায়ুন হাসেন। হাতের পাতা অল্প তুলে 'সব ঠিক আছে' ইশারা করেন। আর তাতে আচমকা জেবুন্নেসার দু'গালের গভীর বলিরেখার ভেতর থেকে উষ্ণ রক্তের একটি ঝলক বের হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ধেৎ, কী ভাবছেন হুমায়ুন! হয় তো ভাবছেন, কোনভাবে পাশের মহিলাকে ম্যানেজ করে জেবুন্নেসা হুমায়ুনকে পাশে বসাবার কথা চিন্তা করছেন।

কিন্তু, তা কি সত্যিই তিনি ভাবেননি! তেমন হলে মন্দ কী হত! গল্প করতে করতে সারা পথ যাওয়া যেত!

কী গল্প করতেন তাঁরা! সেই চায়ের গল্পটিকে কি আবার তুলে আনতেন? মনে মনে কি সেই গল্পটিকে তাঁরা দুজনেই চারিয়ে নিচ্ছেন?

নিচ্ছেন তো নিশ্চয়ই !

হুমায়ুন তো তাঁকে পরিচয়ের সূত্র ধরিয়ে দিতে স্মৃতির চায়ের কাপটিকেই তুলে ধরেছেন। আর ফেরিঘাটের কুয়াশামোড়া সকালে জেবুন্নেসা তো সেই হুমায়ুনকে সাথে নিয়েই খুঁজে বেড়াচ্ছেন এক কাপ চা। এ যেন এক অলৌকিক চায়ের কাপ–অদৃশ্য অধরা, কিন্তু নীল ধোঁয়ার প্রান্তরেখায় এঁকে যাচ্ছে কবেকার এক রোমাঞ্চিত বিকেল, এক ফোঁটা গোলাপ্ল সুবাসে মথিত হয়ে চলেছে তৃষ্ণাতুর উষ্ণ আলজিভ!

কবেকার সেই দিনটি যেন, এই এখন, এক কাপ সুরভিত চা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে জেবুন্নেসার সামনে।

জেবুন্নেসার কাছে অচেনা মনে হবে সেই সৌরভ, আর হুমায়ুন তাঁকে চিনিয়ে দেবেন তার ঘ্রাণ, জানিয়ে দেবেন তার ইতিহাস, শিখিয়ে দেবেন তার তৈরি প্রক্রিয়া। একটি অদ্ভুত বিকেলের সাথে এক কাপ অচেনা চায়ের রসায়নে হুমায়ুন জেবুন্নেসার সামনে নিয়ে আসবেন একটি শিহরন।

চল্লিশ বছর আগের সেই অদ্ভুত বিকেলে, কোনো এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া, নিতান্তই নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতেই হুমায়ুনের বাসায় গিয়ে কড়া নেড়েছিলেন

ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীনও কামরুন কয়েকবার দেখা করেছে জেবুন্নেসার সাথে। নাট্য প্রদর্শনীর কার্ড দিতে এসেছে। লেখা চাইতে এসেছে। জিনস আর ফতুয়া পরা কামরুনকে তখন মনে হত আরও ধারাল, জ্বলজ্বলে। সেই কামরুন! কামরুন নিজে পরিচয় না দিলে চোখের সামনে সারাদিন ওঠাবসা করলেও জেবুন্নেসা তাকে চিনতে পারতেন না। কামরুন একটু বিব্রত ভঙ্গিতে হেসে বলেছে, বিয়ের পরে মনটা বদলে গেল ম্যাডাম।

> ঘরের দরজা খুলে সামনে জেবুন্নসাকে দেখে হুমায়ুন চমকে না গেলেও বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন তা সকৌতুকে লক্ষ্য করেছিলেন জেবুন্নেসা। আর জেবুন্নেসাও যে হুমায়ুনকে চমকে দিতেই চেয়েছিলেন তা তো মিথ্যা নয়। তবে হুমায়ূনের বাসায় সেদিনের বিকেলটা কাটিয়ে যখন নিজের ঘরে ফিরছিলেন তখন এই সাক্ষাৎ হুমায়ুনকে শুধু চমকে দেয়ার জন্য, না তার চেয়ে বেশি কিছু, 'আকাশের ওপারে আকাশ'এর মত কোন রহস্যময়তার কারসাজিতে ঘটে যাওয়া অনিবার্য কোন ঘটনা– তা নিয়েও জেবুন্নেসার মনের অতলে একটা প্রশ্নের বুদ্বুদ ফুটছিল

জেবুন্নেসা।
ঘরের দরজা খুলে সামনে জেবুন্নসাকে দেখে হুমায়ুন চমকে না গেলেও বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন তা সকৌতুকে লক্ষ্য করেছিলেন জেবুন্নেসা। আর জেবুন্নেসাও যে হুমায়ুনকে চমকে দিতেই চেয়েছিলেন তা তো মিথ্যা নয়। তবে হুমায়ূনের বাসায় সেদিনের বিকেলটা কাটিয়ে যখন নিজের ঘরে ফিরছিলেন তখন এই সাক্ষাৎ হুমায়ুনকে শুধু চমকে দেয়ার জন্য, না তার চেয়ে বেশি কিছু, 'আকাশের ওপারে আকাশ' এর মত কোন রহস্যময়তার কারসাজিতে ঘটে যাওয়া অনিবার্য কোন ঘটনা– তা নিয়েও জেবুন্নেসার মনের অতলে একটা প্রশ্নের বুদ্বুদ ফুটছিল।

হুমায়ুন বারবার বলছিলেন, আপনি সত্যিই আসবেন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি।
জেবুন্নেসা সহজ হাসি দিয়ে হুমায়ুনের বিস্ময়কে সহজ করে তুলেছেন।
–আ রে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! আপনার অসুস্থতার খবর পেলে তো আগেই আসতাম।
–ভাগ্য ভালো তখন আসেননি। এলে আমার ক্ষতি হয়ে যেত।
–মানে? এবার ছিল জেবুন্নেসার বিস্ময়ের পালা। আমি আপনার ক্ষতি করতাম!
–হ্যাঁ। কারণ আপনি এলে তখনই আমার অসুস্থতা সেরে যেত। সাত দিনের ছুটি আর পেতাম না।
জেবুন্নেসা মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিলেন। হয় তো তাঁর দুচোখে জেগে উঠেছিল রহস্যময় প্রশ্ন। হুমায়ুন তরল হেসে উঠেছিলেন,
–আপনাকে দেখে ভয়েই আমার জ্বর পালিয়ে যেত। স্টুডেন্টরা যা ভয় পায় আপনাকে! আর জ্বর তো জ্বর।

সাত দিন জ্বরে ভুগে শীর্ণ মলিন চেহারা নিয়ে হুমায়ুন যেদিন কলেজে গেলেন, অনেক সহকর্মীই তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন, কিন্তু জেবুন্নেসা কিছুই জানতেন না। হুমায়ুনকে বললেন, আপনি অসুস্থ ছিলেন না কি, জানতাম নাতো!
হুমায়ুন হালকা কৌতুকে বলেছিলেন, গরীবের ঘোড়ারোগ ম্যাডাম। তার খবর না জানলে কোন ক্ষতি নেই।
জেবুন্নেসা সত্যিই সেদিন বিবেকের দংশন অনুভব করেছিলেন। অকৃত্রিম সহানুভূতিতে হুমায়ুনের স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি জেনেছেন। কলেজের কাছাকাছিই একটা দেড় রুমের বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন হুমায়ুন। একজন কাজের মহিলা আছে। রোজ এসে একবার রান্নবান্না করে দিয়ে যায়। তাঁর স্ত্রী কন্যা থাকেন ঢাকায়। সপ্তাহ দু'সপ্তাহে হুমায়ুন ঢাকায় যান।
কথাবার্তার এক পর্যায়ে সেদিন হুমায়ুন জেবুন্নেসাকে বলেছিলেন, সাবিনা মানে আমার স্ত্রী যদি এখানে থাকত তাহলে আপনাকে আমি বাসায় চা খেতে আমন্ত্রণ জানাতাম। আমার কাছে ভাল ভাল বিদেশি ব্র্যান্ডের চা কফি আছে। একেবারে ক্লাসিক। নানা দেশের চা খাওয়া আমার হবি। আমি কিন্তু খুব ভাল চা বানাতেও পারি।
জেবুন্নেসা হালকা গলায় বলেছিলেন, তা হলে আমন্ত্রণ জানাতে অসুবিধা কোথায়? ভালো চা পাতা আর ভালো চা দাতা দুটি ই যখন আছে!
–সত্যিই যাবেন? চোখের তারা নেচে উঠেছিলো হুমায়ুনের।
–কেন যাব না!
–না মানে, ব্যাচেলর কোয়ার্টার...
হেসে ফেলেছিলেন জেবুন্নেসা।
–আপনি তো ব্যাচেলর নন। দিব্যি মেয়ের বাপ। আর নিশ্চয়ই আপনার কোন নখদন্ত লুকোন নেই, যে কোনো মহিলাকে একা পেয়ে তা বেরিয়ে আসবে! না কি আছে!
হুমায়ুনের চোখে কৌতুক।
লুকান নোখদাঁত থাকলে তা আমি জানব কীভাবে? আমি তো বাবুরাম নই!

হুমায়ুন সেদিন তাঁর ঘরের কোণ থেকে বেতের ছোট টেবিল আর দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে পাতেন জানালার কাছে। গোধূলির স্বর্ণালি আলোর এক টুকরো মসলিন উড়ে এসে পড়ে ওইখানটায়। জানালার পালস্নাটা ভাল করে খুলে দেন।
–আমার ঘরে কোন ভাল ব্যবস্থা নেই। আপনাকে কোথায় কীভাবে বসাই। এখান থেকে দূরের ওই উঁচু মিনারটা দেখা যায়। অস্তাচলের সূর্যের লাল আলো মিনারের সিরামিক নকশায় রিফেক্ট হয়ে দারুণ একটা ম্যুরাল তৈরি করে। আপনাকে দেখাব।
আর কী দেখাবেন হুমায়ুন! একটা ছোটো পারিবারিক এ্যালবাম খুলে পরিচয় করিয়ে দেন স্ত্রী সাবিনা আর মেয়ে সিনথিয়ার সাথে। মিষ্টি মুখের বছর চারেকের মেয়ে।
জেবুন্নেসা বলেন, বাঃ আপনার মেয়েটির চেহারায় খুব আদুরে একটা ডৌল আছে। পানপাতার মত শেপ।
–পানপাতা? আমার কাছে মনে হয় কচুরিপানার পাতা। কেমন চকচকে কোমল। জানেন, আমি তাই ওর নাম রেখেছিলাম হায়াসিন্থ। কচুরিপানা! তাতে আমার বউ গেল রেগে। বলে দুনিয়াতে আর শব্দ পাও না। পরে ও হায়াসিন্থকে বানাল সিনথিয়া।
–আপনার স্ত্রীও খুব সুন্দর।
–হুম, সাবিনা আপনাকে দেখলে ঈর্ষা করবে। আপনি দারুণ গ্রেসফুল। সাদা শাড়িতে আপনার মধ্যে একটা সিলেশটিয়াল বিউটি জাগে। ডোন্ট মাইন্ড, আপনাকে প্রথমে দেখে কিন্তু ভেবেছিলাম উইডো। মানে উইডোরাই সাদা শাড়ি পরেন কি না। কিন্তু যাঁরা জানেন তাঁরা কিন্তু আপনাকে রজনীগন্ধা বলবেন। তবে কালার্ড শাড়িতে আপনাকে নিশ্চয়ই....আপনার হাজব্যান্ড এ নিয়ে আপনাকে কিছু ....
–সাদা শাড়িই আমার পছন্দ। আমি আমার পছন্দেই পোশাক পরি।
হুমায়ুনের কথাকে বাড়াতে দেননি জেবুন্নেসা। জেবুন্নেসাকে বহুবারই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি কারো সাথেই এ বিষয়ে কোন কথা বলেননি।
বিয়ের কয়েক মাস পর একদিন স্বামীর সাথে আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাওয়া উপলক্ষে কুন্দন কাজ করা গাঢ় লাল রঙের শাড়ি পরে জেবুন্নেসা অগ্নিশিখার মত সামনে এসে দাঁড়ালে খবিরুল স্ত্রীকে দেখে এক ভ্রূ তুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ও বাবা, তোমাকে দেখে তো রাস্তায় গাড়িঘোড়া থেমে যাবে! একেবারে রেড সিগন্যাল! এ শাড়ি তুমি পছন্দ করে কিনেছ না কি? উলফিশ!

পড়ন্ত বিকেলের আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মিনারটিতে তখন বর্ণময় মাকাও পক্ষির মত একটা আলোর বর্ণলি ডানা ঝাপটাচ্ছিল। সেই আলোর ছটা এসে পড়ে দু'জনের সোনালি চায়ে। সব কিছু অপার্থিব মনে হতে থাকে। একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চাটা শেষ করে জেবুন্নেসা চুপ করে বসে থাকেন। আর তার কণ্ঠের অতল কোটরেও চুপ করে বসে থাকে একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ। বার্গামট ফুল তিনি কখনো দেখেননি। দেখেননি সেই ফল। জানেন না কেমন তার গন্ধ। জেবুন্নেসার মনে হয়, চা পানের পর এক বিন্দু ভেজা গোলাপের গন্ধ লেগে আছে তাঁর গলার

গায়ে আগুন নিয়েই সেদিনের বেড়ানোটা শেষ করেছিলেন। ফিরে এসে আলমারি থেকে বিদায় করেছিলেন সব রঙিন শাড়ি। সাদায় মুড়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। প্রতিবাদ হিসেবে সাদা শাড়ি পরতে শুরু করলেও পরে জেবুন্নেসা ভালবেসে ফেলেছিলেন সাদাকে। নিজেও যেন নিজেকে সাদা ছাড়া আর কোন পোশাকে ভাবতে পারতেন না।

হুমায়ুন একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, সরি ম্যাডাম। কিছু মনে করবেন না। এটা জাস্ট কথার কথা।

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেন। একটা ডায়েরি এনে তুলে দেন জেবুন্নেসার হাতে।

–কিছু বিদেশি কবিতা অনুবাদে হাত দিয়েছি। মাত্রই শুরু করেছি। বাংলাটা কিন্তু আপনাকে দেখে দিতে হবে। কয়েকটা আছে এখানে।

জেবুন্নেসা কবিতাগুলোতে চোখ বুলিয়ে হেসে বলেন, এলাম আপনার বাসায় চা খেতে আর আপনি মাস্টারিতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! তার চেয়ে আপনিই পড়েন, চা খেতে খেতে শুনি।

হুমায়ুন একটা বক্স এনে জেবুন্নেসার সামনে খুলে ধরেন। নানারকম টি ব্যাগে বাক্সটি ভরা। কোন চা পছন্দ জেবুন্নেসার। খোদ চিনের ইয়ান নানডিয়ান হং বম্যাক টি, আদিগো গোল্ডেন ইউনান, দার্জিলিং টি, নেপালি মাসালা টি, শ্রীলংকান হারবাল টি, কুসমি টি, আর্ল গ্রে... বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্রান্ডের চা।

–য়ে ই বিদেশে যায় আমি তাকে দিয়ে বিখ্যাত ব্রান্ডের চা আনাই। আমার এক সিনিয়ার কাজিন আছেন, পাইলট। ওর কাছ থেকে অনেক পাই। আমার বড় বোন ডালাসে থাকে। ও ও পাঠায়।

–আমি আপনার অতিথি। আপনি যেটা দেবেন, সেটাই আমি খাব।

–ভেরি গুড! কারণ গেস্টের আসা নিজের ইচ্ছায় আর খাওয়া ও যাওয়া হোস্টের ইচ্ছায়। তবে চা ছাড়া বোধ হয় আর কিছু দিতে পারবো না। আপনাকে বিস্কুট চানাচুর মানায় না। ফ্রুটস হলে ভাল হত। কিন্তু ঘরে নেই। কাজের লোকও নেই যে দোকানে পাঠাব। আপনি আসবেন, আগে জানলে মিষ্টিটিষ্টি আনিয়ে রাখতাম।

জেবুন্নেসা বিব্রত।

–বিস্কুট চানাচুর মানাবে না মানে? ওগুলো কি আমি কানে গলায় পরব নাকি? যা আছে তাই নিয়ে আসেন। চানাচুর আমি খুব পছন্দ করি।

কিচেনে হুমায়ুনের কাপপিরিচ নাড়াচাড়ার শব্দ শুনতে শুনতে জেবুন্নেসা কবিতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখেন। হুমায়ুনের বাংলা নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও ভাষায় তেমন দখল নেই। কাব্যিকতাও নেই। অনেক শব্দই জোলো দীপ্তিহীন। তার চেয়ে মূল ইংরেজিগুলো পড়তে পারলে হত। মিলিয়ে দেখা যেত। টেবিলের ওপর বইয়ের স্তূপ। সেখানে হয়তো আছে।

মিনিট দশেকের মাথায় হুমায়ুন একটি ট্রে নিয়ে এসে সাবধানে টেবিলটির ওপর রাখেন। কবিতাগুলো সরিয়ে রাখেন একপাশে। বইগুলো গাদা করে নিয়ে ঝুপ করে নামিয়ে রাখেন বিছানায়।

জেবুন্নেসা দেখেন ট্রে তে নলে টিসু গুঁজে রাখা একটি সাদা টি পট, সাদা শুগার পটে চিনি আর ছোট্ট চামুচ। দুটো পোর্সিলিনের কাপপিরিচ। চিনামাটির নকশা কাটা চৌকো এগ্ন হোল্ডারে বসানো দুটো সেদ্ধ ডিম, অন্য দুটি ডিম আকৃতির চিনামাটির আধারে গোলমরিচের গুঁড়ো আর লবণ। ঝকঝকে দু'টি কাচের গ্লাসে পানি। ছোট্ট সিরামিক হোল্ডারে তেকোণ ভাঁজের টিসু পেপার।

জেবুন্নেসা মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলেন, বাহ! সুন্দর! শুভ্র সমুজ্জ্বল! কিন্তু ডিম কেন? আশ্চর্য! ব্রেকফাস্ট না কি?

হুমায়ুন থতমত খেয়ে বলেন, আসলে ঘরে আর কিছু ছিল না। আর এই সেটটাও আপনার আসা উপলক্ষে উদ্বোধন হয়ে গেল। ডিম খান না? আপনি কুসুম বাদ দিয়ে খেতে পারেন। টি ব্যাগ ভিজিয়েছি। তিন মিনিট লাগবে। আর্ল গ্রে টি। আমার দারুণ পছন্দের চা। আমি খাই উইদাউট মিল্ক এন শুগার। তাতে দারুণ একটা ফ্লেভার পাওয়া যায়। আর দুর্দান্ত সোনালি রঙ। আপনি অবশ্য ইচ্ছে করলে চিনি নিতে পারেন।

পিরিচে কাপ সেট করে হুমায়ুনকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে ফেলেন জেবুন্নেসা।

–স্টপ ওয়াচ হাতে নিয়ে বসলে পারতেন!

কাপে চা ঢালতে ঢালতে হুমায়ুন বলেন, টাইম রেঞ্জ এদিক ওদিক হলে আর্ল গ্রে চায়ের আসল রঙ আর ফ্লেভারটা পাওয়া যাবে না।

ধোঁয়া ওঠা সোনলি চা ভরা কাপটা তুলে দেবার আগে হুমায়ুন নিবিড় তাকিয়ে দেখে নেন তার রঙ। ঘ্রাতে কৌতুকের নাচন তুলে টেনে নেন গন্ধ! পারফেক্ট! বলে জেবুন্নেসার হাতে কাপ তুলে দিয়ে নিজের কাপটি নিয়ে একটু উইশ করার ভঙ্গি করেন।

জেবুন্নেসা চুমুক দেবার আগে হেসে বলেন, আপনি তো রীতিমতো চা কাব্য রচনা করছেন। চিনাদের মত দু'হাতের পাতায় কাপ নিয়ে আড়াই পাক ঘুরিয়ে তুলে দিলেই ষোলো কলা হত।

– উঁহু, যদিও এ চা মূলত চিনের তার পরেও চিনা সংস্কৃতি এখানে চলবে না। এ চায়ের সৌরভ আর খ্যাতির সাথে জড়িয়ে আছে ইতালির বার্গামট বাগান আর ইংল্যান্ডের লর্ড গ্লে র নাম। ইতালির ক্যালাব্রিয়া অঞ্চলে বার্গামট নামে এক ধরনের লেবুজাতীয় ফল জন্মে। বার্গামটের নির্যাস দিয়ে এ চা কে সুরভিত করা হয়েছে। লন্ডনের শার্লটন এন কোম্পানি ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার দ্বিতীয় আর্ল গ্লে র নামে এই চা কে বাজারজাত করে। কারণ লর্ড আর্ল গ্রে এই চা উপঢৌকন পেয়েছিলেন চিনের এক মান্ডারিনের কাছ থেকে, যাঁর ছেলেকে ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন লর্ড গ্লে র কোন এক কর্মচারী। কাজেই দুশো বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী আর্ল গ্রে রীতিমত রাজকীয় চা!

হুমায়ুন সেই বিকেলে আর্ল গ্রে চায়ের সাথে নিয়ে আসেন সুদূরের এক মোহময় অতীতের সুরভি। জেবুন্নেসার মনে হয় তিনি যেন ভূমধ্যসাগরের তীরে কোন এক সুরভিত বার্গামট বাগানের নির্জন নিভৃত ছায়ার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন।

তাঁর গালে ছুঁয়ে যাচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ নীল ফুলের পাপড়ি। বার্গামট ফলের জ্বলন্ত সবুজ রঙ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে অদ্ভুত সুগন্ধি। পড়ন্ত বিকেলের আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মিনারটিতে তখন বর্ণময় মাকাও পক্ষির মত একটা আলোর বর্ণালি ডানা ঝাপটাচ্ছিল। সেই আলোর ছটা এসে পড়ে দু'জনের সোনালি চায়ে। সব কিছু অপার্থিব মনে হতে থাকে। একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চা টা শেষ করে জেবুন্নেসা চুপ করে বসে থাকেন। আর তাঁর কণ্ঠের অতল কোটরেও চুপ করে বসে থাকে একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ। বার্গামট ফুল তিনি কখনো দেখেননি। দেখেননি সেই ফল। জানেন না কেমন তার গন্ধ। জেবুন্নেসার মনে হয়,

হুমায়ুন একের পর এক আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন কবিতা। হুমায়ুনের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উল্লাসস সত্যিই জেবুন্নেসার ভেতরে অনামা একটা লজ্জার শিহরন তুলে যাচ্ছিল। গোধূলির বর্ণময় মিনার কখন আঁধারে ঢেকে যায়। বাইরে তাকিয়ে সংবিৎ ফিরতেই 'ও বাবা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ!' বলে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন জেবুন্নেসা। দীর্ঘসময় বসে থাকার ফলে ভাঁজ ভাঙা শাড়ির এলোমেলো কুচি গুছিয়ে তোলার সাথে গুছিয়ে নিয়েছিলেন শুভ্রতায় মোড়া তাঁর ব্যক্তিত্বও।

চা পানের পর এক বিন্দু ভেজা গোলাপের গন্ধ লেগে আছে তাঁর গলার ভেতরে। যেমন করে 'পরন কথার গন্ধ লেগে থাকে' জীবনানন্দের হাঁসের নরম শরীরে।

বহু কাল পরে এই দুরান্তের পথে বাসের দমবন্ধ পরিবেশে বসেও জেবুন্নেসা যেন সেই এক বিন্দু গোলাপগন্ধ তাঁর আলজিভের তলায় টের পান। আর সেই কবিতাগুলো? সেই গোধূলির বর্ণালিতে হুমায়ুনের মৃদু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুদ্রিত করে দেওয়া কবিতাগুলো!
হুমায়ুনই নির্জনতা ভেঙে বলে উঠেছিলেন, চা ভাল লাগল ম্যাডাম?
দারুণ! তবে বার্গামট ফলের গন্ধ কেমন আমি জানি না। আমার কাছে মনে হয় এক বিন্দু গোলাপনির্যাস মেশান আছে।
জেবুন্নেসার সারা মুখে গোধূলির স্বর্ণাভা ছড়িয়ে পড়েছিল। হুমায়ুনের চোখে কেমন আলো জ্বলে ওঠে। কণ্ঠে মাদকতা।
–এই ট্রি ট্রিটমেন্টটি সত্যিই কমপ্লিট হত, অন্তত একটা গোলাপ যদি থাকতো আজকের টেবিলে। দিস ইজ আ ডিফরেন্ট ইভনিং, অ্যান্ড ইট মেকস এভরিথিং ডিফরেন্ট ইনকুডিং ইউ অ্যান্ড মি।
জেবুন্নেসা স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে থাকেন হুমায়ুনের দিকে। হুমায়ুনের চোখ আরও দীপ্ত।
–উইল ইউ মাইন্ড ইফ আই কল ইউ 'জেবু', জাস্ট ফর দিস মোমেন্ট, ফর দ্যা সেক অব দিস ওয়ান্ডারফুল ইভনিং অফ আর্ল গ্রে টি!
হুমায়ুনের কণ্ঠও কেমন বদলে যাচ্ছিল।
হালকা গলায় হেসে উঠেছিলেন জেবুন্নেসা।
–মানুষের নাম তো ডাকার জন্যই। অনেক স্টুডেন্টই আমাকে জেবু ম্যাডাম ডাকে!
–এভরি মোমেন্ট গোয়িং টু বি ট্রান্সফার্ড ইনটু এনাদার মোমেন্ট। সকাল বদলে যায় দুপুরে। দুপুর বদলে যায় বিকেলে। তারপর রাত্রি এসে ঢেকে দেয় গোধূলির রঙ। আপনার মুখে গোধূলির রঙের ব্রাশ! কাছে এগিয়ে আসে হুমায়ুনের মুখ। জেবু! লেট মি হুইসপার!

দা নুনস গ্রে গোল্ডেন মেশেস মেক
অল নাইট আ ভেইল
দা শোর ল্যাম্প ইন দা স্লিপিং লেক
লাবানাম টেনড্রিলস ট্রেইল
দা স্লাই রীডস হুইসপার টু দা নাইট
আ নেম– হার নেম–
অ্যান্ড অল মাই সোল ইজ আ ডিলাইট
আ সূন অফ শেম...

'এ্যালোন'। জেমস জয়েস। দেখেন এ ব্যাটা নভেলিস্ট হিসেবেই ওয়ার্ল্ড ফেমাস। কিন্তু তিনি কি জানতেন তাঁর এই কবিতা শতবর্ষ পরে কোন এক পুওর ইংলিশ মাস্টারের ঘরে দারুণ একটা বিকেল নামিয়ে আনবে!
মুখ নামিয়ে আনেন জেবুন্নেসা। অভিভূত জেবুন্নেসার মুখে সেদিন আর কথা জোগায়নি।
হুমায়ুন একের পর এক আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন কবিতা। হুমায়ুনের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উল্লাস সত্যিই জেবুন্নেসার ভেতরে অনামা একটা লজ্জার শিহরন তুলে যাচ্ছিল।
গোধূলির বর্ণময় মিনার কখন আঁধারে ঢেকে যায়। বাইরে তাকিয়ে সংবিৎ ফিরতেই 'ও বাবা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ!' বলে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন জেবুন্নেসা। দীর্ঘসময় বসে থাকার ফলে ভাঁজ ভাঙা শাড়ির এলোমেলো কুচি গুছিয়ে তোলার সাথে গুছিয়ে নিয়েছিলেন শুভ্রতায় মোড়া তাঁর ব্যক্তিত্বও।
–যাবেন? অনেক দূর থেকে যেন প্রশ্ন করেছিলেন হুমায়ুন।
–হ্যাঁ, যেতে তো হবেই! খুব সুন্দর একটা বিকেল কাটল। আর্ল গ্রে চা, সুগন্ধের গল্প, কবিতা...
–আমার এখানে আপনার আসাটা আমার কাছে এখনও মনে হচ্ছে স্বপ্ন।
টেবিলে ছড়ানো ছিটানো কাপপিরিচ বইপত্রের দিকে চেয়ে জেবুন্নেসা বলেন, কিন্তু আতিথেয়তা করতে গিয়ে আপনার কাজ তো বেড়ে গেল। লোকজন নেই এমনিতেই..!
জেবুন্নেসার কথায় হুমায়ুন স্বপ্নগ্রস্তের মত আবৃত্তি করেন–

দা ইভনিং অ্যাডভান্সেস, দেন উইথড্রজ অ্যাগেইন
লিভিং আওয়ার কাপস অ্যান্ড বুকস লাইক আইল্যান্ড অন দা ফোর
উই আর ড্রিফটিং ইউ অ্যান্ড আই,
অ্যাজ ফার ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার অ্যাজ দা ইয়াং হিরোজ
অব দোজ টু নভেলস উই হ্যাভ জাস্ট লেইড ডাউন...

– সত্যি, স্রোতের মত আমরা দূরে ভেসে যাই, আর তীরে পড়ে থাকে আমাদের গল্পগুলো, তাই না!
হুমায়ুনের কণ্ঠে বার্গামট বাগানের নীল ফুল ফোটে। নির্যাস ছড়িয়ে পড়ে।
বারান্দা পেরিয়ে জেবুন্নেসা তখন সিঁড়িতে পা রেখেছেন। তাঁর পায়ের পাতা বেয়ে কোন এক অজানা ঝরনার স্রোত সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে হালকা হেসে বলেন, বাহ্ দারুন তো! এটা কার কবিতা?
– টাইডস। বাই হুগো উইলিয়ামস।
– আচ্ছা, ব্যা আ্য ই আজাদ হুমায়ুন! বিদায়ের হাতছানি বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে তরতর করে কয়েক ধাপ নেমে যান জেবুন্নেসা।
ওপরে দাঁড়িয়ে হুমায়ুন হালকা তরঙ্গে পঙ্ক্তি ঝরাতে থাকেন–

সিলেশটিয়াল মেইড অব রোজি হিউ
ও ও লেট মি ফীল দাই রেইন
আই ল্যাঙ্গুইশ টিল দাই ফেস আই ভিউ
দাই ভ্যানিশ'ড জয়'স রিগেইন....

জেবুন্নেসা আবার থামেন। ভ্রূ তুলে হুমায়ুনকে বলেন,
–আপনি কি বইপত্তর ঘেঁটে এসব কবিতা বের করে রেখেছিলেন নাকি?
–আপনি আমাকে জানিয়ে এলে সত্যিই তাই করতাম। ফিলিস হুইটলি র কবিতা, আ ফেয়ারওয়েল টু আমেরিকা!
–আপনার ওপর কবিতার আছর হয়েছে আজ! কৌতুক করেন জেবুন্নেসা।
–আছর না বলেন ভর করেছে। বাগদেবী অতিথি ছিলেন যে!
–হুম। বাগদেবীর কল্যাণে ভালই ভাষার উন্নতি হয়েছে আপনার! হাসতে হাসতে ল্যান্ডিং পেরিয়ে যান জেবুন্নেসা।
–তা হলে আরাধনা কন্টিনিউ করি! আবার কবে আসবেন দেবুন্নেসা?
জেবুন্নেসা আচমকা থেমে যান। কী বললেন?
– দেবী আর জেবুন্নেসার সন্ধি! আবার আমায় মারতে ওপরে চলে আসবেন না তো!
হুমায়ুনের সন্ধ্যা কাঁপানো হাসির তরঙ্গে জেবুন্নেসার ঠোঁটে তখন সংক্রমিত ঢেউ।
"উই আর ড্রিফটিং ইউ অ্যান্ড আই,
অ্যাজ ফার ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার অ্যাজ দা ইয়াং

হিরোজ...”.

ছুটন্ত বাসের মৃদু গর্জনের ভেতর একটা অন্ধ ভোমরার মতো জেবুন্নেসার কানের কাছে পঙ্‌ক্তিগুলো ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। পেছনের সিটে বসে হুমায়ুনও কি ভাবছেন চল্লিশ বছর আগের বিএল কলেজের সেই দিনগুলোর কথা, সেই আর্ল গ্রে চায়ের বিকেলের কথা! সেই কবিতামদির মুহূর্তের কথা! না কি সত্যিই তারা সময়ের স্রোতের টানে পরস্পর বহু দূরে সরে গেছেন? স্রোতে ভেসে গেছে তাঁদের গল্পগুলোও।

তাই তো গেছে। কিন্তু তারপরেও ভাটার টানে দূরে সরে যাওয়া খড়কুটো আবার জোয়ারের ধাক্কায় তীরে এসে উঠেছে। নোনাবালির ওপর তাঁরা ভেজা পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে আচমকা চলে এসেছেন কাছাকাছি!

জেবুন্নেসা সিটে মাথা এলিয়ে চোখ বুঁজে নিজের মনের এই উলুঝুলু ভাব দেখে মনে মনে হাসেন।

মন তুই করিলি এ কি ইতরপনা!

জেবুন্নেসা খানম, আপনি দু'বছর আগে সত্তুর পেরিয়ে এসেছেন!

জেবুরে, তুই কিন্তু এখন এক বাহাত্তুরে বুড়ি! তোর হাড়ে ঘুণ ধরেছে! দু'পাটিতে চারখানা তোর নকল দাঁত! চোখের ছানি কাটানোর পরেও দেখার সমস্যা। ইদানীং কানে ভাল শুনতে পাস না। নাকেও তোর কী যেন যন্ত্রণা!

আর হুমায়ুন? ওর বুঝি বয়স উল্টা দিকে গেছে? ও চোখকানের মাথা খায়নি? খালি রঙাচঙা জামা পরলেই হলো? ও ই তো আমাকে চিনে নিল! কবেকার সেই স্মৃতিকে উসকে দিল! ভাগ্যিস দেবুন্নেসা বলে ডাক দেননি!

জেবুন্নেসা সিটে মাথা এলিয়ে চোখ বুঁজে মুচকে মুচকে হাসেন। সত্যিই, যৌবন কাল একটা দারুণ সময়। সেই বিকেলে যেন এক কাপ নিষিদ্ধ যৌবন পান করে তিনি গোপনে রঙিন হয়ে উঠেছিলেন। আজ বার্ধক্যের শ্বেতপাথরের টেবিলে কোথায় সেই রঙের প্যালেট ও ব্রাশ?

খুলনায় পৌঁছনর পর বাস থেকে নেমে ফোন নম্বর নিয়ে নেন দু'জনেই। জেবুন্নেসার খুব ইচ্ছে হল একদিন হুমায়ুনের সাথে দেখা করার সুবাদে তাঁর কর্মজীবনের স্মৃতিময় কলেজে গিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসবেন। এত বছর পরে নিশ্চয়ই অনেক বদলে গেছে ক্যাম্পাস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয় না। হুমায়ুনের ওয়ার্কশপও শেষ হয়ে গেল। ঢাকায় ফিরে যাবেন তিনি। জেবুন্নেসা বলেন, যাওয়ার আগে আমার ছেলের বাসায় আসেন, চা খেয়ে যাবেন।

হুমায়ুন ফোনে হাসতে হাসতে বলেছেন, আর্ল গ্রে?

–ওই চা আমি পাব কোথায়? ওটা থাকে আপনার কাছে। আমার বড়জোর দার্জিলিং হতে পারে। ছেলেরা ইন্ডিয়া টিন্ডিয়া গেলে ওটা আনে। তবে এখন আছে কি না জানি না।

–আর কী খাওয়াবেন?

–বুড়োদের জন্য আর কী? চিরতার লিকার কিংবা আখের গুড়ে ঘৃতকুমারীর শরবত! ডায়বেটিস থাকলে গুড়ও বাদ। স্যাকারিন কিউবস!

ফোনের রেড বাটন টিপে দেবার পরও যেন ওতে হুমায়ুনের হাসির আওয়াজের সাথে 'বিকেলে আসছি' কথাটা লেগে থাকে। জেবুন্নেসা সেদিকে তাকিয়ে থেকে নাতনি উষ্ণতাকে ডাকেন।

–এই, বাড়িতে ভাল চা আছে নাকি রে?

উষ্ণতা ভুরুতে মারাত্মক একটা গিট ফুটিয়ে বলে, আশ্চর্য! আমরাই তো এ পাড়ায় সবচেয়ে ভাল চা খাই। একেবারে বাগানের চা। শ্রীমঙ্গলে আমার ছোট মামার টি গার্ডেন আছে না! কেন দিদুন?

–বিকেলে আমার এক পুরনো বন্ধু আসবেন। তিনি একজন চা বিদ!

–চা বিদ! চোখের পাতা একটু চেপে হাসে উষ্ণতা। জেবুন্নেসার মনে হয় উষ্ণতা নয়, পনেরো বছরের জেবু হাসছে। এই নাতনিটি অবিকল তাঁর মত হয়েছে। জন্মের পর নাতনির চেহারায় নিজের মুখের আদল দেখে নাম রাখেন সহিষ্ণুতা। পরে 'সহিষ্ণুতা' কাটছাট হয়ে 'উষ্ণতা'। এই নাতনিটিকে জেবুন্নেসার নিজেরই প্রতিরূপ মনে হয়। তাঁর জীবনের অনেক ছোট ছোট গল্পের ভেতরে যেন উষ্ণতাই ঘুরে বেড়ায়। জেবুন্নেসা কি উষ্ণতার হাত ধরে হেঁটে যাবেন চল্লিশ বছর আগের সেই বিকেলে! পৌত্রীর স্মৃতিতে বেঁচে থাকুক পিতামহীর যৌবনের রোমাঞ্চের গোপন বাগান! তাতে এ জগতে কার কী ই বা ক্ষতি হবে!

উষ্ণতা পিতামহীর গল্প শুনে চোখের পাতা মিট মিট করে।

–দিদুন, এই বয়সেও তুমি দেখতে যা সুন্দর, ইয়াং বয়সে তো নিশ্চয়ই মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত রূপ ছিল তোমার! সাদা শাড়িটাড়ি পরে টরে তুমি আমার দাদার প্রতি খুব জাস্টিস করেছিলে। নইলে দাদার খবর ছিল!

–বটে! তা তুই তো আমারই মতন দেখতে। ছোড়াটোড়াদের মাথা ঘোরাতে শুরু করেছিস?

–করবই তো! দাঁড়াও, লাইনটা আর একটু লম্বা হোক...।

–আচ্ছা, দাঁড়া তোর বাপকে বলছি!

কলা দেখায় উষ্ণতা। তা হলে সেও তার বাপকে বলে দেবে দিদুনের প্রেমের গল্প।

–কী সর্বনাশ! তিনি আমার সহকর্মী। বন্ধু! প্রেম দেখলি কোথায়?

–দেখেছি! তোমার চোখে।

–চোখে তো ছানি!

–তার তলায়!

হুমায়ুন এলেন সন্ধ্যায়। আজ তাঁর গায়ে একটা গাঢ় বাদামি রঙের খদ্দরের ফতুয়া। কলারে পকেটে আর হাতার বর্ডারে কমলা কাপড়ের কম্বিনেশন। সেদিনের মতই অবিন্যস্ত সাদা চুল। শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ। একটু ঝুঁকে পড়া দেহ। গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর একটা লুক এসেছে ।

দরজা খুলে দেয় উষ্ণতাই। সালাম দিয়ে দুষ্টু হাসিতে চোখ মিটমিট করে বলে, আমি উষ্ণতা। জেবুন্নেসা আমার দিদুন।

–হ্যালো উষ্ণতা, আমার নাম...

–জানি। আজাদ হুমায়ুন। আপনি দিদুনের চা বিদ বন্ধু।

এক মুহূর্ত থমকান হুমায়ুন। জেবুন্নেসা ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলেন, আমার নাতনি। বেশি মাত্রায় ট্যালেন্ট। ওকে আপনার গল্প করেছি। আপনার চা প্রীতির গল্প।

দুরন্ত হেসে ওঠেন হুমায়ুন।

–সেই জন্য চা বিদ? ওয়ান্ডারফুল! আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম!

উষ্ণতার সাথে গল্প করতে করতে জেবুন্নেসা হুমায়ুনকে ঘিরে রোমাঞ্চকর স্মৃতির যে স্বপ্নকল্পনার জাল বুনেছিলেন, হুমায়ুন আসার পর নাতনির সামনে হঠাৎ করেই কেমন

চোখের পাতা একটু চেপে হাসে উষ্ণতা। জেবুন্নেসার মনে হয় উষ্ণতা নয়, পনেরো বছরের জেবু হাসছে। এই নাতনিটি অবিকল তাঁর মত হয়েছে। জন্মের পর নাতনির চেহারায় নিজের মুখের আদল দেখে নাম রাখেন সহিষ্ণুতা। পরে 'সহিষ্ণুতা' কাটছাট হয়ে 'উষ্ণতা'। এই নাতনিটিকে জেবুন্নেসার নিজেরই প্রতিরূপ মনে হয়। তাঁর জীবনের অনেক ছোট ছোট গল্পের ভেতরে যেন উষ্ণতাই ঘুরে বেড়ায়। জেবুন্নেসা কি উষ্ণতার হাত ধরে হেঁটে যাবেন চল্লিশ বছর আগের সেই বিকেলে!

একটা বিব্রতকর অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যান। সে জন্য যতটা সম্ভব সহজ সাধারণ অতিথি আপ্যায়নের ভঙ্গিতে নাতনিকে বলেন, মেহমানের জন্য নাশতাটাশতার ব্যবস্থা কর উষ্ণতা। দেখো, চা বিদ দাদুর জন্য চা টা যেন ভাল হয়!

হুমায়ুন তখন জাদুকরের মত ফতুয়ার এক পকেট থেকে বের করে আনেন একটি ছোট পকেট সাইজ বই আর এক পকেটে হাত ঢুকিয়ে আনেন চারপাঁচটি ছোট্ট চৌকো সোনালি রঙা প্যাকেট।

– আমার অনুবাদ কবিতার বই। 'পোয়েমস অফ টোয়াইলাইট'। বের হতে কয়েক বছর লেগে গেল। তাও আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে! আপনার হাতেই প্রথম তুলে দেওয়া দরকার ছিল। চেষ্টা করলে আপনার ঠিকানাও হয় তো জোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু কীভাবে যেন তা আর হয়ে ওঠেনি। মাফ চেয়ে এ অপরাধের মোচন হবে না। তবে বইটা গ্রহণ করলে মনে হবে মাফ পেয়েছি। আর এ কয়টা প্যাকেট... আপনার জন্য... । গতকাল আমার ভাগনে এসেছে। আমার সাথেই আসার কথা ছিল। একটা ইন্টারভিউ পড়ে যাওয়াতে আসতে পারেনি। ওকে বলে দিলাম, বইটা আনতে। আর বাসায় যে কয়টা চা আছে অবশ্যই যেন নিয়ে আসে। সেই আর্ল গ্রে চা। লন্ডনের টুইনিং কোম্পনির ক্লাসিকস্ আর্ল গ্রে টি।

জেবুন্নেসার মনে হয় হুমায়ুন পকেটে করে বয়ে এনেছেন অতীতের কোন অলীক বাগানের কয়েকটি বার্গামট ফুলের পাপড়ি। অভিভূত জেবুন্নেসার শুকনো শিরা ওঠা হাতের মুঠোয় চায়ের প্যাকেট ক'টি গুঁজে দিয়ে হুমায়ুন মৃদু হেসে বলেন, কবিতাও আছে, আর্ল গ্রে চা ও আছে। আপনিও আছেন, আমিও আছি। শুধু মাঝখান থেকে আমাদের বয়সটা চলে গেছে। তবে আমরা চল্লিশ বছর আগের সেই বিকেলটাকে সেলিব্রেট করতে পারি, কী বলেন! যদিও সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে।

জেবুন্নেসা বইটি হাতে নিয়ে বলেন, হুম, কবিতাগুলোও সন্ধ্যার! পোয়েমস অব টোয়াইলাইট! আমার চোখেও সন্ধ্যা। এখন দেখার কাজ চললেও পড়ার কাজ একেবারেই চলে না। ম্যাগনিফাইং গ্লাস ট্লাস দিয়ে কোনোমতে...

– আচ্ছা, শোনা তো যেতে পারে!

– কানের মাথাও খাওয়া হয়ে গেছে! কানের কাছে এসে জোরে না পড়লে ভালো বুঝতে পারি না।

উষ্ণতাকে ডেকে চায়ের প্যাকেট কটি ধরিয়ে দেন জেবুন্নেসা। উষ্ণতা প্যাকেটগুলো নাড়াচাড়া করে চোখ মটকে বলে, এই সেই রয়্যাল টি? বাই এপয়েন্টমেন্ট টু হার ম্যাজেস্টি কুইন এলিজাবেথ সেকেন্ড, টি এন কফি মার্চেন্টস টুইনিং অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড লন্ডন...

জেবুন্নেসা কবিতার বইটি হাতে নিয়ে এলোমেলো পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছিলেন। আচমকা সেটিও ছোঁ মেরে হাতে তুলে নেয় উষ্ণতা।

–মাই গড! দাদু, আপনার কবিতা? দিদুন, তোমরা তাহলে প্ল্যান করে আজকে...। বারান্দায় বসবে না কি তোমরা? সাদা গোলাপ গাছে কিন্তু ফুল এসেছে! গোলাপ বারান্দায় কবিতাসন্ধ্যা! সঙ্গে তোমার মেমোরেবল টি!

জেবুন্নেসার কী হয়, মনে হয় একটা নিবিড় বাগান থেকে চয়ন করা একটি গোপন গোলাপ চলে গেছে উষ্ণতার হাতে। উষ্ণতা বালখিল্য কৌতুকের আনন্দে সেটি নিয়ে হাটকে মাটকে খেলতে লেগেছে।

তিনি হঠাৎ কঠিন গলায় উষ্ণতাকে বলেন, বইটি রাখ, বেশি ইঁচড়ে পেকেছ। যা বলেছি তাই কর।

থতমত খেয়ে বই রেখে দেয় উষ্ণতা।

হুমায়ুনও অপ্রস্তুত। পরিস্থিতি সহজ করার জন্য বলেন, উষ্ণতা, ইয়াং লেডি, তুমি কেটলিতে একটু উষ্ণ জল নিয়ে এস। নো শুগার। তবে পানি গরম করার আগে তোমার তর্জনীটা একটু ডুবিয়ে দিও। তাহলেই মিষ্টি হয়ে যাবে। আর তোমার প্ল্যানটা ফ্যানটাসটিক। গোলাপ বারান্দায় কবিতাসন্ধ্যা। তুমি পড়বে, আমরা শুনব।

উষ্ণতা কোন কথা না বলে টিব্যাগগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে যায়।

জেবুন্নেসা নীরবে বইটি নাড়াচাড়া করেন। কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। হুমায়ুন বলেন, আপনার কাছ থেকে টোটাল বইটির ওপরে কমেন্ট আশা করি। অবশ্য আপনার যদি পড়ার ধৈর্য থাকে।

বারান্দায় টেবিল চেয়ার সাজিয়ে উষ্ণতা ডাকতে এলে জেবুন্নেসা এবার হেসে ফেলেন।

– তুই কি আমাকে পালোয়ান ভেবেছিস। শীতের বাতাস শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে খোলা বারান্দায় বসলে আমার কী হবে? ব্রঙ্কাইটিসের পোয়াবারো হবে না? আর আপনার গায়েও তো হালকা জামা।

হুমায়ুন নিজের ফতুয়াটা দেখেন।

– হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। বুঝতে পারিনি। ঢাকায় কিন্তু এসি চালিয়ে ঘুমাই। আর খুলনাতে দেখছি বিকেলেই শীত লাগছে।

উষ্ণতা বারান্দার টেবিল থেকে সব কিছু তুলে এনে নীরবে সোফার সামনে গ্লাসটপ টিপয়টাতে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

জেবুন্নেসা চুপচাপ পিরিচের ওপর কাপ সেট করেন। ট্রান্সপারেন্ট টি পটে ভেজানো আর্ল গ্রে চায়ের ব্যাগ থেকে ধীরে গাঢ় মধুর মতো মায়াবী একটা রঙ ছড়িয়ে যেতে থাকে। অদ্ভুত একটা টেকশ্চার। বাইরে নির্জনতার ভেতর থেকে সন্ধ্যাটা যেন হালকা কুয়াশার শ্বাস ছাড়তে থাকে। জেবুন্নেসা বেভুল আঙুলে প্লেট নিমকি মিহিদানা বিস্কুট এধার ওধার করেন।

হুমায়ুন হঠাৎ বলে ওঠেন– ইউ হ্যাভ বিন লস্ট সামহয়্যার! লেটস হ্যাভ টি।

– তিন মিনিট হল নাকি? সহজ হয়ে ওঠেন জেবুন্নেসা।

চল্লিশ বছর আগের অবিকল স্বর্ণালি রঙ নিয়ে আর্ল গ্রে চায়ে ভরে ওঠে দুটি কাপ। হুমায়ুন একটু হেসে নিজের কাপটি জেবুন্নেসার কাপের সাথে ছুঁইয়ে বলেন, একটি বার্গামট বাগানের বিকেলকে মনে করে...। কাপ থেকে সুরভিত নীল ধোঁয়ার রেখা হুমায়ুনের মুখের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, আহ্ সেই ঘ্রাণ!

জেবুন্নেসা বিহ্বল ঠোঁটে চায়ের কাপটি ছোঁয়াবার আগে গোপনে টেনে নেন ধোঁয়া। তিনি কোন সৌরভ পান না। ছোট্ট একটি চুমুক দেন। বার্গামট ফুলের সুরভি কোথাও নেই! গন্ধবিহীন উষ্ণ তরল তার কণ্ঠনালী বেয়ে নামতে থাকে।

–জেবু, আপনি টের পাচ্ছেন আপনার সেই এক বিন্দু গোলাপের গন্ধ? দারুণ রেমিনিস্ন্ট এই স্মেল! খুব মনে পড়ছে আমার সেদিনের বিকেলটি। সেই গোধূলি। একটা ওয়ান্ডারফুল স্পেকট্রাম। সব কিছু কেমন কবিতার মত। একটা অলৌকিক সন্ধ্যা যেন...। আজকের পরে হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না.... ।

চায়ে চুমুক দেয়ার ফাঁকে হুমায়ুন কথা বলতে থাকেন। জিভের হালকা জড়িমায় অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো লতিয়ে যায় কথাগুলো। ভাল বোঝা যায় না।

জেবুন্নেসা আলজিভের তলায় শুধু তপ্ত চায়ের জ্বলুনিই টের পান। শিশিরভেজা গোলাপের সেই স্বপ্নসম্ভব ঘ্রাণ বিন্দুমাত্রও অনুভব করেন না। তিনি জানেন, কোনো কিছুর ঘ্রাণই তিনি পাবেন না। বেশ কয়েক বছর হল অ্যানোজমিয়ায় ভুগছেন তিনি। বহু বছর আগে একবার একটা স্কুটারের ধাক্কায় রিকশা থেকে প্রায় দশহাত দূরে ছিটকে পড়েছিলেন জেবুন্নেসা। মাথাটা ঠুকে গিয়েছিল আর একটা প্রাইভেট কারের সঙ্গে। অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও দু'বছর পর মাথায় একটা সার্জারি করতে হয়েছিল তাঁর। পরবর্তি সময়ে ধীরে ধীরে তাঁর ব্রেন্ন এর স্মেল নার্ভ ইনএ্যাকটিভ হয়ে যেতে থাকে। এখন কোন কিছুরই গন্ধ পান না জেবুন্নেসা।

একসময় হুমায়ুনকে তিনি শিখিয়েছিলেন বাতাসের একটি প্রতিশব্দ হলো 'গন্ধবহ'। এখন স্মৃতির বাগানে হেঁটে বেড়াতে গিয়ে হোঁচট খান জেবুন্নেসা। এখন তাঁর বাতাস কোন গন্ধই বহন করে না। তাঁর চায়ের কাপ থেকে গন্ধবিহীন ধোঁয়া উড়তে থাকে। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট সুঁচালো করে চায়ের কাপে একের পর এক ক্যাজুয়াল সিপ দিয়ে চলেন জেবুন্নেসা।

ঝর্না রহমান ছোটগল্পকার

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

শিলাইদহের কবিতা
রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

পদ্মা নদীর চরে কচ্ছপের ডিম খুঁজতে বেরিয়েছেন জগদীশচন্দ্র।
যুবক আচার্যের পরনে এখন মালকোঁচা মারা ধুতি, সঙ্গী কিশোর রথি। শীতের রোদেলা সকালে চিকচিক করছে বালুর চর। বিলেতফেরত বিজ্ঞানীর বিক্রমপুরি অভিজ্ঞতার জোরে একটু খুঁড়তেই বেরিয়ে এল একতোড়া কচ্ছপের ডিম– হাততালি দিয়ে উঠল রথি। কোথাও মিলল আস্ত কচ্ছপ– একবার উল্টে দিতে পারলেই বাছাধন কুপোকাৎ। বালক ও বিজ্ঞানীর আনন্দ আর ধরে না!

আজ রবিবার। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছুটি। রবিবাবুর সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা হবে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীবন্ধুর আবদারে প্রত্যেক সপ্তাহান্তে একটি করে নতুন গল্প শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কবি। লেখা চলছে 'কথা ও কাহিনি'র আখ্যানমূলক কবিতাগুলিও। আর এর উপর কচ্ছপের ডিম, মাংসসহকারে গফুরের হাতের জম্পেশ খানা। কবি এমনিতে মিতাহারী, কিন্তু বন্ধুবাৎসল্যে দরাজ। সম্প্রতি সপরিবারেই আছেন শিলাইদহে। সেই সূত্রে উইক্লএ ভগুলোতে কবিসঙ্গ পেতে আসছেন জগদীশচন্দ্র, লোকেন পালিত, অক্ষয় মৈত্রেয়, দ্বিজেন্দ্রলাল, নাটোরের মহারাজ।

আরও আগে রথির বাবাও যখন ছেলেমানুষ, জ্যোতিদাদার সঙ্গে এসেছেন শিলাইদহের কুঠিবাড়ি, সেই যখন আবদুল মাঝি এনে দিত পদ্মা থেকে সদ্য ধরা ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম।

কিন্তু সেসব গল্প কীর্তিনাশার পানিতে তলিয়ে গেছে। তুলে আনতে দেরি নয়– কোনদিনই তুলে আনা যাবে না। হারিয়ে গেছে পদ্মা, মেঘনা, মধুমতী, চলনবিল, মধুসূদনের কপোতাক্ষ। বাংলা কবিতা হারিয়েছে তার নদীকে। বাংলা কবিতায় আজ একটা, দুটো, তিনটে ভুবন। পশ্চাৎভূমি ছাড়া কি বন্দর বাঁচে? কিংবা শিকড় ছাড়া গাছ? আয় ইরম, আয় প্রদীপ, আয় তমোজিৎ, ইঁটচাপা ঘাসের মত নাগরিক, ছিন্নমূল বাংলা কবিতাকে ফের জলপানিতে নাইয়ে আনতে যাই শিলাইদহ কি গোয়ালন্দে।

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী ভারতের কবি

কবিতার খাতা
সোফিয়ার রহমান

যখনই প্রিয়ার কথা লিখব বলে কলম ধরি
আদিবাসী মাগিরা এসে ভিড় করে
আট ন'বছরের ন্যাঙটো পোঙারা বসে পড়ে
খাতায়, পাতায় প্রান্তরে–

ছান্না পোনার সামনে নৈসর্গিক সঙ্গমে
বাধা নেই
তবু যেন লাশকাটা ঘ রে দু'টি লাশ
হাঁড়িয়ায় নেশা হয় না
মগ্নিমিন সে পেপসিতে মুখ দিয়ে
কবিতার খাতায় শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে

রাস্তার সূত্র
অঞ্জন মেহেদী

আমিও শিশিরের ঘাসে
হাঁটতে গিয়েছিলাম অন্যদের মত
ভোরের পবিত্র আলোর হাত ধরে

তোমাকে বহুদূর গিয়ে পাব বলে
এতটা পথ আমি সাথে করে এনেছি

মাঝ পথে তুমি আমার
হাত ছেড়ে দিলে
শহরের ব্যস্ত ভিড়ের ভেতর

তারপর নিজেকে রাখলে আড়াল করে
বীজগণিতের সূত্রের মত রহস্যঘেরা

আমি কোন সূত্র জানি না
আমি চিরকাল অংকে কাঁচা ছিলাম

আর যারা যারা আমার সাথে
হাঁটতে বেরিয়েছিল মহাকালের রাস্তায়

তারা এখন বিছিন্ন দ্বীপ হয়ে গেছে
তারা আজ তোমার মত মৃত হয়ে গেছে

মন ভাল নেই
অঞ্জনা সাহা

বৃষ্টি ঝরছে মেঘলা আকাশ ফুল্ল বাগান
নীল প্রজাপতি
মনে পড়ল এক লহমায় দূর শৈশব
মন ভাল নেই।
বৃষ্টি ভেজানো উষ্ণ মাটির গন্ধমাতাল
বসন্তদিন
সত্যি বলছি এখন আমার
মন ভাল নেই।
দেখছ নাকি একটি দোয়েল
ভর দুপুরে
একলা একা গান শুনিয়ে আমায় কেমন
উদাস করে!
ঠিক যেন সে ব্রজের রাখাল, বাঁশির সুরে
ফাঁদ পেতে দেয়
আমার কি আর সাধ্য এমন, ইচ্ছে হলেই
তার কাছে যাই!

হাওয়া বাস্তবিক
শিমুল আজাদ

যখন অস্থির প্রাণ দলে মলে যায় সুধাবেশ।
চেষ্টারা বিফলে সড়ক নির্মাণে যে রোলার তার–
ভার আত্মায় মেধায় চিবিয়ে বিষিয়ে তোলে খুব।
ভিতব্লেবাহি রে উদ্বিগ্ন প্রাণের চিহ্ন হাঁসফাঁস;
ধ্বংসকে জাগায় ভিন্নতা নির্মাণে প্রয়োজনপথে,
কালো পিচ রাবারের চাকা গড়িয়ে মাড়িয়ে ছোটে;
মোটরসাইকেল, মার্সিডিজ, কার, ট্রাক, বাস হর্নে,
ঘূর্ণিঝড় গতি পায় সভ্যতার দুরন্ত লগনে।
মুহূর্তে সংবিৎ পায় নিজস্ব চেতন ঢুকে পড়ে,
বাঁচে অজানার রূপ্পরঙ ঢ ঙে রহস্য কিনারে।

নিষ্কৃতির প্রহর যে আসে না তা নয়! আসে জাগে,
ভ্রমরার মত কালোর মহিমা ছুঁড়ে গুনগুন–
সংগীতের উপমায় চারিপাশ মাতিয়ে সে যায়।
ক্ষণিক খনির টানে মৌমাছি স্বভাব ফুলে ফুলে,
ভোলে কোথা বাস অর্জিত কালের সুধা আন্তরিক!
বাদ্য বাজে শব্দঘরে নেতার ভাষণ চাপা পড়ে,
বিভ্রমে জাতির সবল যুবক ক্ষরণের গান–
গায় আপন আদলে যদি সম্ভাবনা বাঁচে পথে।

পরাজয়
কাজী লাবণ্য

হাজার নিরীক্ষার পথ খুঁজে
স্ববৈদ্যের সেই অমোঘ সত্য উচ্চারণ–
তুমি কাগজি ফুলের রেণু কিংবা ডুকুর ফুলের সারবত্তা
অথচ বর্ণিল বন্ধ্যা সময় দমাতে পারেনি
সামাজিক তাল্মচাবির কলরব।

এর মাঝে কতবার শীতার্ত মানুষেরা
একটু উষ্ণতার জন্য আগুনে পুড়িয়েছে হৃদয়ের বাকল।

আমিতো মেনেছি তোমার সকল বৈকল্য
কেবল মানতে পারি না আমাদের ছোট্ট
পৃথিবীর বিভক্তি বা ব্যাধের মিথ্যা তীরের তর্জমা।

অথচ কালের কালিতে লেখা, সিংহ কেশরের হ্যাঙ্গারে ঝোলান
সেই ঐশ্বর্যবান প্রতাপ পুরুষ, তুমি
বইতে পার না জ্যোৎস্নার তাপে পোড়া খাওয়া
এক নারীর মৌন বিসর্জন!!

লক্ষ্মীটেরা
বদরুল হায়দার

জীবনের সব তারাগুলি দিয়ে
তোমাকে সাজাতে চাই বলে
অস্তাচলে অকূলে ভাসাই প্রেমতরী।

সুখের সাজানো গীত গেয়ে যায়
ঢেউমালা। দিলভরা বরষায়
নিজেকে আপন জেনে ঋণী হই
অভাগার দরিয়ায়।

আবাসনে নাচে শূন্যরথ
পাষানের মনগত টানে
আদান প্রদানে আনে কালো দিনরাত।

প্রভাত কুয়াশা ঠেলে ফেলে দেয়
গহীন আঘাত। আমি সংবাদ শিরোনামে
মন বেচে তোমাকে বোঝাই।

লক্ষ্মীটেরা তোমার স্বরূপ চিনে
বীণাতারে জীবনের সানাই বাজাই।

একটি কথা
রোকসানা আফরীন

কেউ যা বলেনি কোনদিন
তা তুমি বলেছিলে
কেউ যা কখনো করেনি
তা তুমি করেছিলে

একদিন হঠাৎ তুমি চোখ তুলে বলেছিলে
'কবিতা লিখলে কি চুল আঁচড়ানো যায় না?'
এই একটি কথা বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে,
নাচতে থাকে, টলতে থাকে...
এই কথাটা কেন বললে? কেন বললে?
আমি যে খুব লোভী, কাঙাল
আমার যে আর এই আদরের
যোগ্যতা নেই–
এর চাইতে আমায় তুমি ঘেন্না কর
উপেক্ষা দাও
বের করে দাও তোমার অমন
মেঘের আলোর প্রাসাদ থেকে–

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন ড. দুলাল ভৌমিক

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু-কি শোরযুবাব ৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজসরল ভাষায় এমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উলেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই রাজা বি ক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যুষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। একা জে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরু হল রম্ভাউর্বশীর নৃত্য-গীতের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ক্ষমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্যখচিত একটি ব হুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে কিনা তা অনুস ন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপণ্ডিত বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা কিনা।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিক্ষেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগয জ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্যবীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

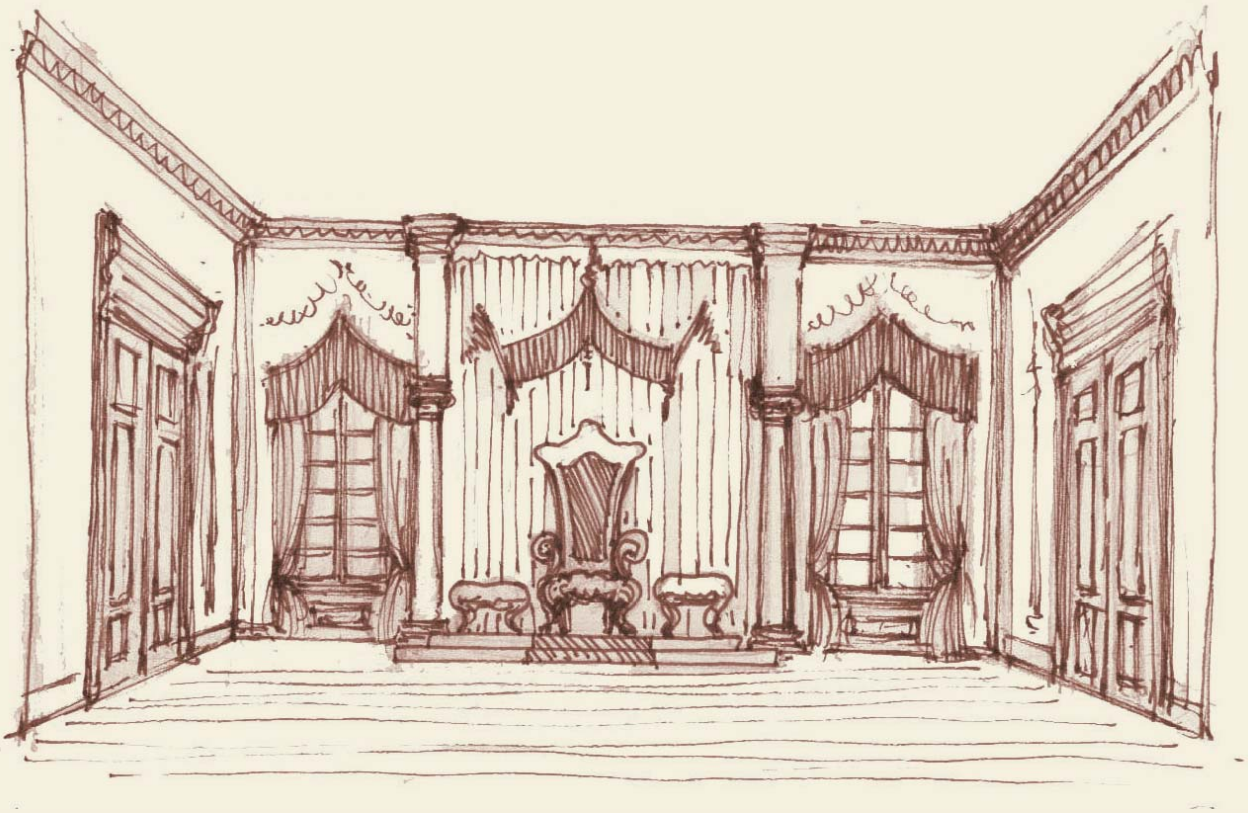

তৃতীয় পুতুলের গল্প

ভোজরাজ তৃতীয় পুতুলের মাথায় পা দিয়ে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলেন। তখন তৃতীয় পুতুলটি বলল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দানশীল ও উদার হন তাহলে এই সিংহাসনে বসার অধিকারী হবেন।

ভোজরাজ বললেন: কি রকম?

পুত্তলিকা বলল: মহারাজ বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত দানশীল ও উদার ছিলেন। তিনি একদিন ভাবলেন– এ সংসার অস্থায়ী। অর্থ-সম্পদও চিরস্থায়ী নয়। সৎকাজে ও সৎপাত্রে দান করাই হচ্ছে অর্থের সদ্ব্যবহার। এরূপ চিন্তা করে তিনি 'সর্বস্ব-দক্ষিণ-যজ্ঞ' নামে একটি যজ্ঞ শুরু করলেন। তাতে তিনি সমস্ত দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ যক্ষ ও মুনি-ঋষিকে আমন্ত্রণ জানালেন। সমুদ্রকেও আমন্ত্রণ জানানোর জন্য একজন ব্রাহ্মণকে পাঠালেন।

ব্রাহ্মণ সমুদ্রের কাছে গিয়ে বারংবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু সমুদ্র এল না। অগত্যা ব্রাহ্মণ যখন উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন সমুদ্র এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে এসে বলল: ওহে ব্রাহ্মণ, মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন তাতেই আমি প্রীত হয়েছি। আমার অন্যত্র কর্তব্য কর্ম আছে। তাই আমি যেতে পারছি না। তবে প্রীতি উপহার হিসেবে আমি মহারাজকে চারটি রত্ন দিচ্ছি। প্রথম রত্নটি কোন বস্তুর কথা ভাবামাত্রই তা এনে দেবে। দ্বিতীয়টি অমৃততুল্য খাদ্য প্রস্তুতে সক্ষম। তৃতীয়টি অশ্ব গজ হস্তী প্রভৃতি কামনা করামাত্রই সংগ্রহ করে আনবে। এবং চতুর্থ রত্নটি দিব্য আভরণাদি প্রদান করবে।

ব্রাহ্মণ উজ্জয়িনীতে ফিরে রত্ন চারটির ক্ষমতা ব্যাখ্যা করে মহারাজকে দিলেন। কিন্তু তখন যজ্ঞ শেষ। যজ্ঞে দক্ষিণা প্রদানের সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই মহারাজ ব্রাহ্মণকে বললেন: আমাকে ক্ষমা করবেন। যজ্ঞে দক্ষিণা প্রদান শেষ। তাই আপনি এই রত্ন চারটির যে-কোন একটি গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন: মহারাজ! আমি বাড়ি গিয়ে পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্রদের মতামত নিয়ে তারপর যে-কোন একটি রত্ন নেব।

এই বলে ব্রাহ্মণ বাড়ি গেলেন এবং সবার মতামত নিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দিল। তাই পরের দিন রাজদরবারে এসে ব্রাহ্মণ বললেন: মহারাজ! আমার পরিবারের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত। তাই আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। এখন আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন।

একথা শুনে রাজা চারটি রত্নই ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিলেন।

এই কাহিনি শেষে পুত্তলিকাটি ভোজরাজকে বলল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত এরূপ দানশীল ও উদার হন, তাহলে এই সিংহাসনে বসার উপযোগী হবেন।

পুত্তলিকার মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এরূপ দানীশলতা ও উদারতার কথা শুনে ভোজরাজ নীরব হয়ে রইলেন।

চতুর্থ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ যখন চতুর্থ পুতুলের মাথায় পা দিয়ে পুনরায় সিংহাসনে উঠতে গেলেন, তখন চতুর্থ পুতুলটি বলে উঠল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শরণাগত-রক্ষক, পরহিতব্রতী ও উদার হন, তাহলে এই সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার যোগ্য হবেন।

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কেমন শরণাগত-রক্ষক, পরহিতব্রতী ও উদার ছিলেন?

পুত্তলিকা বলল: তবে শুনুন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অপুত্রক। তাই একদিন তিনি স্ত্রীকে বললেন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। স্ত্রী বললেন: অপুত্রকের স্বর্গলাভ হয় না– এটা শাস্ত্রের কথা। পদ্মের দ্বারা যেমন সরোবর, উৎসবের দ্বারা যেমন দেবমন্দির, হংসের দ্বারা যেমন নদী, পণ্ডিতের দ্বারা যেমন সভা শোভা পায়– তেমনি সুপুত্রের দ্বারা বংশ শোভা পায়।

স্ত্রীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ পুত্রলাভের আশায় দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা শুরূ করলেন। তাঁর কঠোর আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে মহাদেব তাঁকে পুত্রলাভের বর দিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণী এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ব্রাহ্মণ তার নাম রাখলেন দেবদত্ত। দেবদত্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে বিবাহ করানো হল। তারপর একদিন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। যাওয়ার প্রাক্কালে পুত্রকে বললেন: যতই বিপদাপন্ন হও-না-কেন, কখনো স্বধর্ম ত্যাগ করবে না। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযুক্ত হবে। পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে না। প্রতাপশালীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। ধার্মিকদের পথ অনুসরণ করবে। ভেবে-চিন্তে মতামত ব্যক্ত করবে। আয় বুঝে ব্যয় করবে। আর দুর্জনকে পরিহার করে চলবে।

পুত্রকে এরূপ উপদেশ দিয়ে ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক বারাণসী গমন করলেন। এদিকে দেবদত্ত পিতার উপদেশ অনুসারে দিনাতিপাত করতে লাগল।

দেবদত্ত একদিন কাঠ সংগ্রহ করতে বনে গেছে। দৈবক্রমে মহারাজ

বিক্রমাদিত্যও ঐদিন মৃগয়ার্থ ঐ বনে গিয়ে উপস্থিত। কিন্তু একটি মৃগকে অনুসরণ করতে-করতে তিনি গভীর বনে পথ হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর দেবদত্তের সহায়তায় তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেবদত্তের ব্যবহারে খুশি হয়ে তাকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করেন।

এদিকে দেবদত্ত মহারাজের মহানুভবতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বহু কীর্তির কথা শ্রবণ করে তাঁকে একদিন পরীক্ষা করতে চাইল। তাই সুযোগ বুঝে একদিন রাজপুত্রকে সে অপহরণ করল। রাজপুত্রকে একটি গুপ্ত স্থানে রেখে তার গায়ের অলঙ্কার খুলে নিয়ে স্যাকরার কাছে গেল বিক্রি করতে। স্যাকরা দেখেই চিনে ফেলল এ রাজপুত্রের অলঙ্কার। সে দেবদত্তকে আটকে রেখে রাজাকে খবর দিল। রাজার লোক এসে দেবদত্তকে রাজদরবারে নিয়ে গেল। রাজা জানতে চাইলে সে বলল: মহারাজ! অর্থের লোভে আমি এ কাজ করেছি। এখন আপনি যে দণ্ড দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব।

সভাসদরা বললেন: এর মৃত্যুদ- দেওয়া হোক।

কিন্তু মহারাজ বললেন: এ আমার শরণাগত। তাছাড়া সঙ্কটকালে এ আমার বিশেষ উপকার করেছে। কাজেই একে কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত হবে না।

মহারাজের একথা শুনে দেবদত্ত করজোড়ে বলল: মহারাজ! আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি এ-কাজ করেছিলাম। আপনি সত্যিই মহান।

এই বলে সে রাজপুত্রকে এনে রাজার সামনে উপস্থিত করল।

কাহিনিশেষে পুত্তলিকাটি বলল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজের ন্যায় এরূপ শরণাগত-রক্ষাক হন, কৃতজ্ঞ ও দয়াশীল হন, তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পুতুলের কথা শুনে ভোজরাজ আর অগ্রসর হলেন না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

● পরবর্তী সংখ্যায়

ড. দুলাল ভৌমিক
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

শিল্পকলা

বিজন আলোকপাত

বিপ্লব গোস্বামী

নিজস্ব শিল্পবোধনির্ভর জীবনচর্চা অনেক সময়ই নিজের কাছে যথেষ্ট সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয় না। এবোধ অল্প বিস্তর সকলেরই আছে। নিজের জীবন চর্চা ও জীবন চর্যা এই দু'টি বিষয়কে নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করা খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে। যেখানে আপন ব্যক্তিসত্তা মিলে মিশে যায়, সেক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক হওয়াটা যথার্থই কঠিন। অথচ সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয় না যে বিষয়, তাকে কি সবসময় দূরে সরিয়ে রাখা যায়, নাকি তা আদপেও করা উচিত? ঐ আল্পে আঁধারির মায়া মাখানো পথের এক নিজস্ব আকর্ষণীয়তা আছে। গভীর শৈল্পিক মন ও চিন্তন বোধ যার আছে তার পক্ষে এ দুই আকর্ষণ এড়ানো সম্ভবপর নয়। এই বোধ শিল্পচর্চাকারীদের প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর আছে। আমরা যারা সে পথের পথিক তারা সবাই এটা বুঝি। নিজের অজান্তে কখন যে সেই বোধ সঙ্গী হয়ে যায় এবং পায়ে পায়ে এই কঠিন পথে চলা শুরু হয়ে যায় সেটাও অনেক সময় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। জীবনে পথ চলার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হওয়া; এটি এক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। জীবন্ন প্রেক্ষাপট বারে বারেই শৃঙ্খলার গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করে আবার অবুঝ মন সেই শৃঙ্খলা ভেঙে বেরোতে চাইবে এটাও স্বাভাবিক। এই দুইয়ের টানাপোড়নের ফলেই সামঞ্জস্য তৈরি হয় এবং সেটি সম্বল করেই মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠে।

যতই ভাবা যাক না কেন যে, স্বচ্ছতার আশ্রয়েই জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করা হয়; একথাও অস্বীকার করতে নেই যে অস্বচ্ছতার গুরুত্বও কিছু কম নয়। এ দুইয়ের মিলেই সামাজিক আল্পে আঁধারির মায়াময়তাকে বুঝে নিতে হয। যার সেই বোধ এবং চৈতন্য আগে আসে তার মনন ও চিন্তন তত বেশি সূক্ষ্ম ও ধারালো হয়ে ওঠে। ফলে তার পক্ষে ইতিবাচক দিকগুলি থেকে তো

নান্দনিক শিল্পকলার জগতে এক প্রধান সুবিধা হল, এই পথের পথিকেরা কোন না কোনভাবে অগ্রজদের আদর্শ হিসেবে পেয়ে যান। এ ভাবেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগে যাঁরা সে পথ দিয়ে হেঁটেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লেগে যায়। বিশেষত সূক্ষ্মতার নিরিখে অগ্রজদের অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই অনুজদের এমনভাবে এগিয়ে দেয় যে, প্রকৌশলী প্রয়োগ এবং আদর্শ্ব তাত্ত্বিক চিন্তা, চেতনাবোধ, মনন, চৈতন্য ইত্যাদি অনেক বেশি মাত্রায় ধারালো হয়ে

বটেই, নেতিবাচক দিকগুলি থেকেও তৃপ্তি লাভ সহজ হয়ে ওঠে। নান্দনিক শিল্পকলার জগতে এক প্রধান সুবিধা হল, এই পথের পথিকেরা কোন না কোনভাবে অগ্রজদের আদর্শ হিসেবে পেয়ে যান। এ ভাবেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগে যাঁরা সে পথ দিয়ে হেঁটেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লেগে যায়। বিশেষত সূক্ষ্মতার নিরিখে অগ্রজদের অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই অনুজদের এমনভাবে এগিয়ে দেয় যে, প্রকৌশলী প্রয়োগ এবং আদর্শ্ব তাত্ত্বিক চিন্তা, চেতনাবোধ, মনন, চৈতন্য ইত্যাদি অনেক বেশি মাত্রায় ধারালো হয়ে ওঠে। বিজন চৌধুরীর শিল্পজীবন ও ব্যক্তিজীবন দুইয়েরই বৈচিত্র্যময়তা বড়ই চিত্তাকর্ষক। স্বল্প পরিসরে এই উপস্থাপনা অত্যন্ত কঠিন; এটা খুব কম বলা হয়। কোন একটি প্রবন্ধে এক শিল্পীর জীবনচর্চা ধরতে চেষ্টা করাটা শুধুমাত্র কঠিন বা অসম্ভব তা নয়, বরং সে প্রচেষ্টা কিছুটা অবান্তর বা অর্বাচীনও বটে। অথচ এই পথের পথিক হিসেবে যিনি আগে হেঁটেছেন তাঁকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করাটা যথেষ্ট যৌক্তিক। এটি সেই পথে হাঁটতে চাওয়া পরবর্তীজনের নিজের সঙ্গেই করা উচিত। এটা না করলে শুধু নিজের সঙ্গে নয় ভবিষ্যৎকালের প্রতিও অন্যায় করা হয়। তাঁর জীবনযাত্রা ও শিল্পজীবনকে এক নজরে আমরা এইভাবে দেখতে পারি:
জন্ম: ১৯৩২। মৃত্যু: ১৬ মার্চ ২০১২।

জন্মস্থান: কলকাতা শহরের কালিঘাটের পটুয়াপাড়া অঞ্চলে।

পিতা: কুঞ্জবিহারী চৌধুরী। মাতা: বিনোদিনী চৌধুরানী। শিল্পীর মাতাপিতা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এর বাসিন্দা হলেও দাদার চাকরির সূত্রে তাঁর কলকাতায় আগমন এবং বসবাসের শুরু।

প্রথম জীবন: প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা কলকাতা শহরেই ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমিতে। এখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সরকারি আর্ট স্কুলে (যেটি বর্তমানে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ নামে পরিচিত) ভর্তি হন। এখানেই শিল্পশিক্ষার শুরু। প্রথম আঁকার অনুপ্রেরণা পান বাবার কাছ থেকে। বাবা পেশায় ছিলেন বঙ্গশ্রী পত্রিকার সাংবাদিক। অন্যদিকে আঁকা, গান্ন বাজনা, নাটক লেখা ইত্যাদিতেও হাতযশ ছিল। শৈশবকাল থেকেই শিল্পের প্রতি অদম্য স্পৃহা ও বিশেষ আকর্ষণ লক্ষণীয়। সে আকর্ষণ থেকেই সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় বাবার রং না বলে নিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করতেন। সে সময়ে বকুনি জুটলেও পরবর্তীকালে বাবাই তাঁকে তুলি, কাগজ, বোর্ড কিনে এনে দেন আঁকায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য। সেই প্রথম আঁকা। তাঁর ভাষায়... 'এক রাখাল বালক মাঠে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে, কয়েকটি গৃহপালিত পশু ঘাস খাচ্ছে। এই ছবিটি পেনসিল ও কালি কলম দিয়ে করেছিলাম। বাবা ছবিটি দেখে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন এবং বঙ্গশ্রী পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। এই ঘটনা সেই সময় আমাকে দারুন প্রেরণা যোগায়।'

জীবন চলার পথে আমরা প্রত্যেকটি মানুষই কোন না কোনভাবে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হই বা প্রভাবিত করে থাকি; সেটি কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর কারণে হোক আবার সুকর্মের জন্যই হোক। শিল্পী বিজন চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ হয় তাঁর জীবনের শেষ বেলায়। খুব বেশি সময় সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ হয়নি তবে যেটুকু পেয়েছি তা মনে রাখার মত। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটি আজও স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান। ২০১০ সালে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নড়াইলে মধুমতি নদীর কাছে শিল্পশিবিরে ভারতীয় অতিথিশিল্পী হিসেবে এসেছিলেন। সেখানে বয়সে ছোট এবং শিল্প অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর থেকে অনেক পিছনে থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বভাবসুলভ গুণে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে পারাটা যেমন সৌভাগ্যের, তেমনি তাঁর মত মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারাটাও সমানভাবে চিত্তাকর্ষক। তিনি সেদিন যে সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, জীবনে সেই অভিজ্ঞতা এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে আজীবন রক্ষিত থাকবে। তাঁর বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহারের কারণে সম্পর্ক ঘনীভূত হয়; যার পার্থিব অস্তিত্ব শেষ হয়, যেদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তিম যাত্রায় সঙ্গী হতে বাধ্য হই শ্মশান পর্যন্ত এবং তাঁর নশ্বর দেহ মিলিয়ে যায় চিতার আগুনে। তাঁর নিজের হাতে করে উপহার দেওয়া কিছু ড্রইং এক অমূল্য ব্যক্তিগত সম্পদ। উপস্থাপনাগুলির রৈখিক বলিষ্ঠতা, নান্দনিক আবেদন আজও সমানভাবে মনকে নাড়া দেয়। এবার আসা যাক, তাঁর কথায়।

তাঁর বাবা নিয়মিত উৎসাহিত করতেন আঁকার ব্যাপারে। মায়ের সস্নেহ অনুপ্রেরণা ছিল একথা বলাই

বাহুল্য। বড় দাদার প্রতিবেশী বন্ধু শিল্পী পিনাকী ভট্টাচার্য নিজে সরকারি আর্ট স্কুলের একজন প্রাক্তনী ছিলেন। স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝতে পেরেছিলেন, কিশোর বিজন চৌধুরীর মধ্যে শিল্পী হওয়ার প্রভুত সম্ভাবনা আছে। ফলস্বরূপ বিভিন্ন জায়গায় যখন স্কেচ করতেন, বিজন চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পিনাকী ভট্টাচার্যের উদ্যোগেই পরবর্তীকালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষে বিজন চৌধুরী গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময়ে সার্ভিস ক্লাবে নিয়মিতভাবে দেশ্ল বিদেশের দৃশ্যকলা শিল্পীরা আসতেন তাঁদের প্রদর্শনীর সম্ভার নিয়ে। এই নিয়মিত উপস্থাপনের ফলে কলানুরাগী ও ছাত্র ছাত্রীরা বৃহত্তর বিশ্বে শিল্পের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে যে নতুন উদ্ভাসিত শিল্প সৃষ্টি হত, তার নিয়মিত রসাস্বাদনের সুযোগ পেতেন। স্লে সময় এক প্রথিতযশা পশ্চিমী শিল্পী মুরেড বোর্ন কলকাতায় আসেন। সার্ভিস ক্লাবে তাঁর কাজের প্রদর্শনী হয়। ব্রিটিশ নাগরিক হবার সুবাদে তিনি লন্ডনের রাস্তাঘাটে ছবি আঁকার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি এর সদ্ব্যবহার করেছিলেন পুরোমাত্রায়। মূলত গ্রাফিক্সশিল্পী ছিলেন তিনি, স্কেচ করতে বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর কাঠ কয়লা, কালি স্কেচ পেন ইত্যাদিতে করা কাজগুলি সাড়া ফেলেছিল। বড় শহরকে বিষয়বস্তু করে এমন প্রাণবন্ত চিত্রময়তার সৃষ্টি অনেকের মনেই সুদূরপ্রসারী ছাপ ফেলেছিল, এই অনেকের মধ্যে বিজন চৌধুরীও ছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি এ সময়ে কালিঘাটের রাস্তা, বাজার, মন্দির, খিদিরপুর ব্রিজ এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলির ওপর প্রচুর ছবি আঁকেন। এই সময়েই তাঁর জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল খ্যাতিমান শিল্পী অতুল বসুর কাছ থেকে তেল রং সংক্রান্ত শিক্ষালাভের সুযোগ। ঘটনাক্রমে এই সময়েই আদ্যিনাথ চক্রবর্তী নামে আরেক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ইনিও গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন এবং সরকারি তথ্য দপ্তরে চাকরি করতেন। একদিন বিজন চৌধুরী আর্ট স্কুলের কাজ জমা দেওয়ার জন্য বাজারে বসে স্কেচ করার সময় আদ্যিনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর প্রভাবেই মার্কসবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বিজন এবং পরবর্তীকালে এই মতাদর্শ তাঁর জীবনে এক সুদীর্ঘ ছাপ রেখে যায়।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে নেওয়া ভাল, বিজন চৌধুরী মৌলিকভাবে মানব সাম্যবাদে বিশ্বাস রাখতেন। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার ওঠাপড়া এবং সেই কারণে সাম্যবাদী ভাবনার ওপরে নানান আঘাত আসার ব্যাপারগুলিকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারতেন না। আপাতদৃষ্টিতে উদারপন্থী মানবতাবাদী অথচ ভিতরে ভিতরে গোঁড়া রক্ষণশীল– এমন মানুষ তিনি দেখতে পারতেন না। তাঁর কাছে সাম্যবাদী ভাবনা শুধুমাত্র শেখানো বা তথ্যের মাধ্যমে আহরিত কিছু ফাঁকা বুলি কপচানো অথবা বসবার ঘরে আরাম কেদারায় বসে শুধুই আলোচনা করে যাওয়া– নিছকই এমন ছিল না। সাম্যবাদী মতাদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথার্থভাবে পালিত হোক এমনটাই তিনি চাইতেন। তাঁর ছবির মধ্যে সেই চেতনা ও বোধ নিয়তই স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই ভাবনা তিনি পেলেন কোথা থেকে? ফিরে তাকানো যাক তাঁর জীবনের দিকে। আদ্যিনাথ চক্রবর্তী নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্থানে আউটডোর স্কেচ করার জন্য সঙ্গী হিসাবে বিজন চৌধুরীকে নিয়ে যাচ্ছেন আর গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে সে সময়ে চলছে এক টালমাটাল অবস্থা। মনে রাখতে হবে, এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী হলেও এর শিক্ষাদান দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সেকেলে। শান্তিনিকেতন কলাভবনে মেয়েরা শুরু থেকেই দৃশ্যকলার বিবিধ শাখায় অনায়াসে এবং অবাধে শিক্ষা নিতেন। অথচ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের আগে পর্যন্ত মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। একইভাবে, ভারতের স্বাধীনতার আগেই বিশ্বভারতী যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পথে এগিয়ে গেছে, তখনও গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল সে ব্যাপারে যথেষ্ট পিছিয়ে। ফলে কলাভবনের ছাত্র ছাত্রীরা ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি যে কোন পরীক্ষা দিক না কেন, সরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলমোহর পেতে কোন অসুবিধা ছিল না, অথচ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন। কারণ এটি শুধুমাত্র একটি স্কুল। তাই চল্লি শের দশকের মধ্যভাগ থেকে এটিকে কলেজে রূপান্তরের আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রথম সারির কয়েকজনকে শাস্তিস্বরূপ রাসটিকেট করা হয়। এদলে বিজন চৌধুরীও ছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বদান্যতায় চল্লি শের

সাম্যবাদী মতাদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথার্থভাবে পালিত হোক এমনটাই তিনি চাইতেন। তাঁর ছবির মধ্যে সেই চেতনা ও বোধ নিয়তই স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই ভাবনা তিনি পেলেন কোথা থেকে? ফিরে তাকানো যাক তাঁর জীবনের দিকে। আদ্যিনাথ চক্রবর্তী নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্থানে আউটডোর স্কেচ করার জন্য সঙ্গী হিসাবে বিজন চৌধুরীকে নিয়ে যাচ্ছেন আর গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে সে সময়ে চলছে এক টালমাটাল অবস্থা।

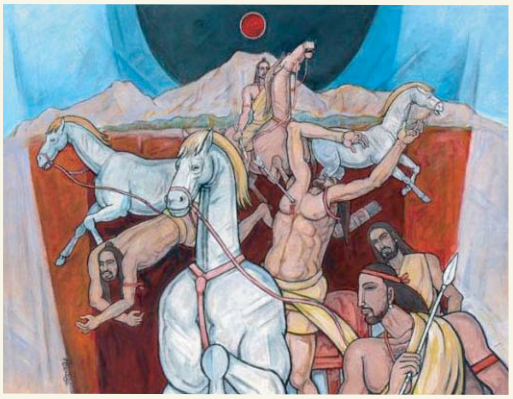

বিজনের ঢাকা থেকে কলকাতায় ফেরার সময়ে শিল্পী নীরদ মজুমদার চিত্রকলায় উন্নততর কলাকৌশলের শিক্ষা নিয়ে প্যারিস থেকে কলকাতায় এসেছেন। বিজন চৌধুরী তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান এবং তাঁর কাছ থেকে নতুন ধরনের প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করেন। শিল্পী যখন বিবিধ শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, তাঁর বয়স নিতান্তই অল্প। শিল্পচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র তখনও অনেকটাই বাকি।

দশকের শেষের দিকে বিজন ঢাকায় যাওয়ার সুযোগ পান– সেখানে বিদগ্ধ সভায় নিজের প্রবন্ধ পাঠের সুবাদে শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর প্রস্তাবে বিজন চৌধুরী ঢাকা আর্ট কলেজ (বর্তমানে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট) থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার সুযোগ পান।

বিজনের ঢাকা থেকে কলকাতায় ফেরার সময়ে শিল্পী নীরদ মজুমদার চিত্রকলায় উন্নততর কলাকৌশলের শিক্ষা নিয়ে প্যারিস থেকে কলকাতায় এসেছেন। বিজন চৌধুরী তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান এবং তাঁর কাছ থেকে নতুন ধরনের প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করেন। শিল্পী যখন বিবিধ শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, তাঁর বয়স নিতান্তই অল্প। শিল্পচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র তখনও অনেকটাই বাকি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন অনেক নতুন ভাবধারার সম্পর্কে সচেতনতার জন্ম দিয়েছিল। ফলে প্রাচীন শিল্প ঐতিহ্যগুলি যেমন নতুন কলেবরে পুনর্জন্ম লাভ করে, তেমনি নতুন উদ্যমে চর্চিত হবার ব্যাপারটিও বেশ গুরুত্ব পায়।

অবশ্যই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। উপমহাদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আকর্ষণীয় শিল্প ভাবধারা দৈনন্দিন জীবনচর্চার অঙ্গ হিসেবে স্থান পেলেও তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটি কোনদিনই খুব ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। পশ্চিমী ভাবধারা অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই অনেক সময় আমাদের আপন শিল্পকলাই শুধু নয়, নিজেদের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তুলেছিলাম। বিজ্ঞাননির্ভর জিনিসও একটি সময়ের পরে পুরনো হয়ে গেলে আর ব্যবহার্য নাও থাকতে পারে অথচ পরম্পরাগতভাবে তার মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। শিল্প অঙ্গনে বিষয়টি কিন্তু অন্যরকম। বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আইনস্টাইনের মতে, বিজ্ঞানভিত্তিক সৃষ্টি কালের বিচারে এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা এবং সেটা যে কেউ একজন করবেনই কিন্তু শিল্পসৃষ্টি একেবারেই অনন্য, অসাধারণ, বিশিষ্ট। এই কারণেই 'The field of art and aesthetics is supremely unique, no two are alike and never can be'– বক্তব্যটি সর্বকালের জন্য সত্য। তাই শিল্পকলার জগতে একবার কোন কিছু তৈরি হলে তা প্রকৌশলগতভাবে কতটা নিখুঁত– সেটুকুই খালি নিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়। তার নান্দনিক আবেদন প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে নানারকম হতে পারে।

বিজন চৌধুরী ইউরোপীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একেবারেই প্রথাগত নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে, কিন্তু অন্যান্য শিল্পধারার প্রকৌশলও তাঁর মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল তাদের নিজস্ব নিয়মে। কালীঘাটের পটচিত্রের নিটোলতা তাঁকে টেনেছিল। এই ধারায় রৈখিকতা থাকলেও এটির উপস্থাপনাভঙ্গী ইউরোপীয় ভঙ্গিমার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন একটি সৃষ্টির মধ্যে বিবিধ বিষয়ের উপস্থাপনা থাকলে ভেতরকার বিভাজিকা রেখাগুলি সুস্পষ্ট করে দেওয়ার ধারা ইউরোপীয় শৈলীতে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিদ্যমান। এই প্রভাব থেকে আধুনিক ও উত্তর আধুনিককালের শিল্পীরা প্রবলভাবে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন। বিজন চৌধুরী উপস্থাপনার ত্রিমাত্রিক করণ কৌশলকে খুবই পছন্দ করতেন। অতএব এর প্রভাব তাঁর ছবিতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তার মূল কারণ তাঁর শিল্প চর্চার শুরুটা ইউরোপীয় ভাবধারায় সূচিত হয়েছিল। এর পরে যখন তিনি ধীরে ধীরে ভারতীয় চিত্রচর্চার ইতিহাসের দিকে পিছনে ফিরে তাকাতে শুরু করেন তখন অজন্তা গুহা চিত্রমালা থেকে শুরু করে প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের প্রথমদিককার মধ্য উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলা তাঁকে সমানভাবে প্রভাবিত করতে থাকে। এইসব চিত্রকলায় দ্বিমাত্রিকতার প্রভাব খুব বেশি। বহু গুণীজন তাঁকে এই পুরনো শিল্প কীর্তিগুলির প্রকৌশল সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করেছেন, সে সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছেন। এইভাবে প্রাচ্য ভাবধারার মুক্ত ভাবনাও তাঁকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। বিভিন্ন প্রান্তিক নৃগোষ্ঠী বা উপজাতীয়দের করণকৌশল তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন মন দিয়ে এবং প্রয়োগ করেছেন দ্বিধাহীনভাবে। বহু গুণীজনের সান্নিধ্য তাঁকে যেমন অসাধারণ শিল্পী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, তেমনিভাবে এই সমস্ত ভাবনার আত্মীকরণে তাঁর নিজস্ব মতামত ও ভাবনা তৈরিতেও সাহায্য করেছে। একথা তিনি বিশেষভাবে মানতেন যে, দৃশ্যকলার চর্চাকারী হলেও দেশজ চারুকলার অভ্যাস থাকলে প্রান্তীয় নান্দনিকতা কাল্প প্রেক্ষাপটে বিশেষ স্থান করে নেয়। তিনি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। লৌকিক মানসিকতা যেখানে আঞ্চলিক প্রকৃতিকে নির্ভর করে বেড়ে উঠছে সে সব জায়গাকে বিশেষভাবে সম্মান করতেন। নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ছোটনাগপুর মালভূমি ও তার আশেপাশের রুক্ষ পরিবেশে বসবাসকারী মানুষজনের সাধারণ শিল্পনির্ভর জীবন তাঁকে বিশেষভাবে টানত। এভাবেই পরবর্তীকালে সেই সব শিল্পী তাঁর অন্তরে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল বলেই তাঁর কবিত্ব অনুপ্রাণিত সৃষ্টিগুলিতে সরল বলিষ্ঠ রৈখিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিজন চৌধুরী এভাবেই খুঁজে নিয়েছেন সমাজ সচেতনতানির্ভর শিল্পের মাধ্যমে আত্মনিবেদনের পথগুলি।

জয়নুল আবেদীন, নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন প্রমুখের সঙ্গে থেকে তিনি কতকগুলি জিনিস অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে যেমন বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তেমনি বিভিন্ন শিল্পধারাকে বিশেষ প্রায়োগিক পদ্ধতিতে সংমিশ্রিত করে তাদের পরিবর্ধিত রূপ দেওয়ায় কুণ্ঠিত হতেন না। শিল্পী নিজেই একথা বহুবার স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কর্মচেতনা ও শিল্পদর্শনচেতনা কোথাও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেও কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে আলাদা থেকেছে। তাছাড়া মাধ্যমগুলিকে সংমিশ্রিত করাই লক্ষ্য– এই মানসিকতায় আক্রান্ত হলে শিল্পের চটকদারিত্বটুকুই শুধু থাকে, তার সৌন্দর্য ও দার্শনিক গভীরতায় বিশেষ ঘাটতি থেকে যায়।

শিল্পীর জীবনের প্রথম দিককার ছবিতে যেমন ছবির বিষয়ই ছিল তাঁর কাছে মুখ্য, পরবর্তীকালে সেই জায়গা থেকে কিছুটা সরে এলেও আদতে এই মানসিকতাই তাঁকে চিরকাল তাড়া করে ফিরেছে। দৃশ্যকলার গজদন্ত মিনারে তিনি কোনকালেই বাস করেননি। সমাজ সচেতনতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি অঙ্গ। সেই যুগের টালমাটাল অবস্থা তাঁকে বারেবারেই নাড়া দিয়েছে। বিজন চৌধুরী মুরেড বোর্ন্ল এর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কেচ এবং পেনসিল ড্রইংয়ে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছিলেন। হুবহু যা দেখতেন তাই আঁকাটাই শিক্ষানবিসির প্রয়োজনীয়তা ছিল বটে কিন্তু সেখানেও নিজস্ব ছাপ রেখে যাবার চেষ্টা তখন থেকেই অবচেতন মনে কাজ করতে শুরন্ন করে। কথোপকথনে নিজেই জানিয়েছেন যে, ছোটবেলা থেকেই শুধুমাত্র বস্তুবাদী পর্যবেক্ষণনির্ভর শিল্পসৃষ্টির প্রতি ঝোঁক বেশি ছিল বলেই তাঁর কবিতা অনুপ্রাণিত সৃষ্টিগুলিতে বলিষ্ঠ রৈখিকতার প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

বিজন চৌধুরী প্রয়োগবিধির সীমা এবং অনুপাত সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন খুব স্বাভাবিকভাবেই। একথা ঠিক যে, যা লেখা আছে সেটা যেমন পড়তে হয়, ঠিক তেমনি যা লেখা নেই সেটাও পড়ে নিতে হয় অর্থাৎ to read between the lines– এই বিষয়টি শিল্পীকে তাঁর মানসচক্ষুর পর্যবেক্ষণবৈশিষ্ট্যে বিশেষ এক ধরনের দার্শনিক ক্ষমতা দান করেছিল। বিজন শেষ জীবন পর্যন্ত যা এঁকেছেন তার মধ্যে সবসময়ই কোন না কোন বিষয়ের উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। প্রাকৌশলিক দিক দিয়ে তাঁর কোন নতুন দক্ষতা অর্জনের অবকাশ ছিল কিনা এই প্রসঙ্গ আজ অবান্তর। বিংশ শতাব্দীর ষাট, সত্তর এবং আশির দশকজুড়ে তিনি যেভাবে কাজ করে গেছেন তাতে চিত্তাকর্ষক উপাদান কতটা আছে বা নেই তা নিয়ে তর্কবিতর্ক থাকতেই পারে কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক কাজ, ফরমায়শি ও গতানুগতিক এবং দুইয়েরই প্রভাব আছে এমন কাজ, এই তিন ক্ষেত্রকেই তিনি সমান গুরুত্বের চোখে দেখতেন। রসিকজনেরা আজ থেকে বেশ কয়েক যুগ পরেও তাঁর কাজের মধ্যে ভাবনার খোরাক পাবেন। তাঁর কাজে discourse বা 'প্রতর্ক' আছে– গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারলে সেটা অবশ্যই বোঝা সম্ভব। তিনি মনকে নাড়া দেন; ভাবতে বাধ্য করেন; বিশেষদিকে টেনে নিয়ে যান– একথাগুলি যেকোন সমাজ বিজ্ঞান্ন সচেতন গবেষক স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কোনওভাবেই তাঁর এই দিকটিকে সরিয়ে রাখার উপায় নেই। ঠিক এই জায়গাতেই তিনি স্বকীয়ভাবে কালজয়ী হবার বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন।

বিপ্লব গোস্বামী তরুণ চিত্রশিল্পী

শিল্পীর জীবনের প্রথম দিককার ছবিতে যেমন ছবির বিষয়ই ছিল তাঁর কাছে মুখ্য, পরবর্তীকালে সেই জায়গা থেকে কিছুটা সরে এলেও আদতে এই মানসিকতাই তাঁকে চিরকাল তাড়া করে ফিরেছে। দৃশ্যকলার গজদন্ত মিনারে তিনি কোনকালেই বাস করেননি। সমাজ সচেতনতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি অঙ্গ। সেই যুগের টালমাটাল অবস্থা তাঁকে বারেবারেই নাড়া দিয়েছে। বিজন চৌধুরী মুরেড বোর্ন্ল এর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কেচ এবং পেনসিল ড্রইংয়ে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছিলেন।

শিল্পোদ্যোগ

মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা

১৯৪৫ সালে যেটি ছিল একটি ইস্পাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কয়েক দশক বাদে সেটিই একটি বহু শতকোটি রূপির ব্যবসায় গ্রুপে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারত য়েরা তে নিয়তির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জেগে ওঠে, অধুনা মুম্বই (তখনকার বোম্বে)এর দুই ভাই স্বাধীনতার প্রথম প্রহর থেকে চার চাকা উইলিস জিপ সংযোজনের কাজ শুরু করেন। এই জিপ সেদিন ভারতের মোটরযাত্রায় নতুন পথ দেখিয়েছিল।

জে সি মহিন্দ্রা ও কে সি মহিন্দ্রার সেদিন দৃঢ় প্রতীতী জন্মেছিল যে, নতুন জাতির সমৃদ্ধির চাবিকাঠি হবে নতুন ধরনের পরিবহন যান। কাজেই তাঁরা মুম্বইয়ের উইলিস জিপ সংযোজনের অনুমতি চাইলেন, তাঁদের মাথায় ছিল ভারতের রাস্তায় চলাচলের উপযোগী শক্তপোক্ত অথচ সরল যান নির্মাণের।

১৯৪৭ সালে উইলিস জিপ নিয়ে মহিন্দ্রার যাত্রা শুরু হয় ভারতে এবং বিশ্ব অঙিনায়। ভারতে বিশ্বায়নের পথিকৃৎ মহিন্দ্রা ভ্রাতৃদ্বয় গত কয়েক দশকে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সঙ্গে যৌথ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলেছেন এবং *মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা* ভারতের অন্যতম বৃহ শিল্প গ্রুপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

স্বাধীনতার দু'বছর আগে দুই ভাই গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে সেদিনের বোম্বে শহরে *মহিন্দ্রা এন্ড মোহাম্মদ* নামে একটি ইস্পাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। দেশভাগের পর গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানে চলে যান এবং নতুন দেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী হন। ফলে কোম্পানি *মহিন্দ্রা এন্ড মোহাম্মদ* থেকে *মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা*এ রূপান্তরিত হল।

চেয়ারম্যান কে সি মহিন্দ্রার ১৩ বছরের গতিশীল নেতৃত্বে *মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা* ভারতের বিভিন্ন শিল্প মহলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর পুত্র কেশব মহিন্দ্রা ১৯৪৮ সালে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে যোগ দেন এবং ১৯৬৩ সালে চেয়ারম্যান হন।

উত্থান ও বাঁকবদল

অতীতপানে তাকালে বলতে হয়, ভারতের তথাকথিত লাইসেন্সরাজের সেই যুগে হাজার বিধিনিষেধের মধ্যে একজনকে উৎপাদন কাজে যেতে হত। স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতারে মহিন্দ্রাকে নতুন বৃত্তে ঢুকতে হয়েছে, অনেক অপ্রাসঙ্গিক ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। গত শতকের ষাটের দশকে দেশে যখন সবুজ বিপ্লবের ঢেউ উঠল, মহিন্দ্রা ট্রাকটর ব্যবসায়ে ঢুকে পড়ল।

fun. family. forever.

১৯৮১ সালে জে সি মহিন্দ্রার পৌত্র ও হরিশ মহিন্দ্রার পুত্র আনন্দ জি মহিন্দ্রা ভারতে ফিরলেন হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি নিয়ে। যোগ দিলেও মহিন্দ্রা ইউজিন স্টিল কোম্পানি (মাসকো)র অর্থ পরিচালকের নির্বাহী সহকারী হিসেবে। তরম্নণ মহিন্দ্রা দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে উপরে উঠলেন এবং নতুন নতুন ভাবনা দিয়ে গ্রুপের বহুমুখী বিস্তার ঘটালেন।

মহিন্দ্রা মাসকোয় তার দক্ষতার শান দিলেন এবং বাড়িঘর নির্মাণ ও সেবাখাতের মত নতুন ব্যবসায়ে কোম্পানিকে নেতৃত্ব দিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রার উপ্ল ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হলেন। একই বছর ভারত লাইসেন্সরাজ থেকে বেরিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে যাত্রা শুরু করল।

অচিরেই মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা তথ্য প্রযুক্তি, আইটি, রিয়েল এস্টেট, অবকাশযাপন কেন্দ্র এবং গ্রামীণ অর্থায়নের মত ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করল। মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে কোম্পানিকে দক্ষ ও আগ্রাসী করে তোলার ব্যাপারেও মহিন্দ্রা উদ্যোগ নেন।

১৯৯৪ সালে গ্রুপ প্রথম বড় ধরনের পুনর্গঠনে হাত দেয় এবং ৬টি সুনির্দিষ্ট খাতে ব্যবসায়কে বিভক্ত করে। ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে আনন্দ মহিন্দ্রা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হন।

নতুন সহস্রাব্দের ঊষালগ্নে মহিন্দ্রা গ্রুপকে আরো বহুমুখী করলেন– খুচরা ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়ে প্রবেশ করলেন। ২০০২ সালে স্করপিওর যাত্রা শুরু হল। নিজস্ব প্রযুক্তি, নকশা উদ্ভাবনে মহিন্দ্রার প্রথম স্পোর্টস্ ইউটিলিটি মোটরযান মহিন্দ্রাকে নকশা ও প্রকৌশলের এক নতুন যুগে নিয়ে গেল, প্রথমবারের মত মহিন্দ্রা আন্তর্জাতিক বাজারে ঢুকল।

১৯৪৫ সালের একটি ছোট ইস্পাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে মহিন্দ্রা গ্রুপ বহুশতকোটি রুপির ব্যবসায় গ্রুপে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষভাবে নির্মিত এই অর্জন– গত সাত বছরে কমপক্ষে ৬০টি– প্রকৌশল থেকে আইটি, আইটি থেকে আকাশযান ও দু'চাকার গাড়ি– এ সবই গ্রুপের প্রবৃদ্ধিগত রণকৌশলের কেন্দ্রবিন্দু।

গত দশকের প্রধান অর্জনগুলির মধ্যে আছে পঞ্জাব ট্রাকটরস লি. (২০০৭), কাইনেটিকস দু'চাকার বিজনেস ও চিনা ট্রাকটর প্রতিষ্ঠান ইয়ান চেং ট্রাকটরস হুয়ানঘাই (২০০৮), সত্যম কম্পিউটার সার্ভিসেস্ লি. অস্ট্রেলিয়া মহাকাশ প্রতিষ্ঠান এয়ারোস্টাফ অস্ট্রেলিয়া ও গিপস্ল্যান্ড এয়াররোনটিকস (২০০৯), কোরিয়ার সানইয়ং মোটর কো. এবং রেভা ইলেকট্রিক কার কো. (২০১০)।

এসব ক্রয় যেমন কোম্পানিকে নতুনতর বৃত্তে নিয়ে গেছে, অন্যগুলো একে অন্যতমের অবস্থান ধরে রাখতে শক্তি যুগিয়েছে। প্রায় পাঁচ দশক রাজত্বের পর কেশব মহিন্দ্রা শিল্পসাম্রাজ্যের শাসনভার তুলে দেন ভাইপো আনন্দ মহিন্দ্রার হাতে ২০১২ সালের ৯ আগস্ট। এদিন আনন্দ মহিন্দ্রা কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হন।

শিল্পমণ্ড @২০১৪

বিভিন্ন দেশে কমপক্ষে ১৪০টি কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রম্নপের ৩১ মার্চে সমাপ্ত অর্থবছরে গড় রাজস্বের পরিমাণ ১হাজার ৬শো ৫০কোটি ডলার। যাত্রীবাহনের ক্রয় যখন ১০ শতাংশ পড়ে গেছে, তখন মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা লি.এর অগ্রযাত্রা ধরে রাখাটা কঠিন ছিল। তবে দেশীয় বাজারে বিদেশী অটো প্রস্তুতকারকদের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। এক্সাইজ কর বৃদ্ধির কারণে প্রবৃদ্ধি কমে এসেছে, পেট্রোল ও ডিজেলের দামে পার্থক্য হ্রাস পাওয়ায় এবং দরিদ্র অর্থনৈতিক মনোভাব ক্রেতাদের নতুন কেনাকাটা থেকে বিরত রাখছে।

বিরূপ কারণে ব্যবহারিক যান পরিম-লে মহিন্দ্রার অংশ আগের বছরের ৪৭.৮ শতাংশ থেকে ২০১৪য় ৪৩ শতাংশে নেমে এসেছে। হারানো জমি ফিরে পেতে ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারাতে কোম্পানি পরবর্তী ১৫ মাসে আরও ৫টি নতুন পণ্য বাজারে আনবে।

ইতোমধ্যে মহিন্দ্রা গ্রামীণ সমৃদ্ধি, টেকসই নগরায়ন, যোগাযোগ, পর্যটন ও অবকাশযাপন, ডিজিটাল রূপান্তর ও নিরাপত্তার মত খাতসমূহের গভীরে ঢোকার পরিকল্পনা করছে। এ বছরে প্রথম দিকে গ্রুপের রিয়েল এস্টেট শাখা মহিন্দ্রা ডেভেলপারস্ লি. স্বল্পমূল্যের বাসস্থান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা গ্রুপের ৯ তথ্যচুম্বক

- কে সি মহিন্দ্রা ছিলেন কেমব্রিজের ধারাবাহিক বস্থু– তাদের দলের সদস্য।
- জে সি মহিন্দ্রা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় টাটা আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানির বাণিজ্যিক বিভাগের প্রধানের পদ ছেড়ে মাত্র ১ রুপি বেতনে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত খাতের কন্ট্রোলার পদে যোগ দেন।
- ১৯৫৬ সালে মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রার শেয়ার বিএসইতে তালিকাভুক্ত হয়।
- সত্যমএর আকার কর্মিসংখ্যার অনুপাতে টেক্কমহি ন্দ্রার দ্বিগুণ।
- আনন্দ মহিন্দ্রা হার্ভার্ডে চলচ্চিত্র নির্মাণবিষয়ে পড়ালেখা করেন।
- ১৯৯৬ সালে ক্লাব মহিন্দ্রার যাত্রা শুরু হয় মুন্নারে একটিমাত্র রিসর্ট নিয়ে, এখন এর সংখ্যা দেশেবি দেশে ৪০টি।
- ২০১০এ মহি ন্দ্রা বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত ট্রাক্টর ব্র্যান্ড।
- মহিন্দ্রা ওয়ার্ল্ড সিটি, চেন্নাই ভারতের প্রথম কার্যকর বিশেষ অর্থনৈতিক জোন।
- মহিন্দ্রা এয়ারোস্পেস ভারতের প্রথম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা ভারতের বিমান চলাচল বাজারে অপেক্ষাকৃত ছোট বিমানযান তৈরি করে।

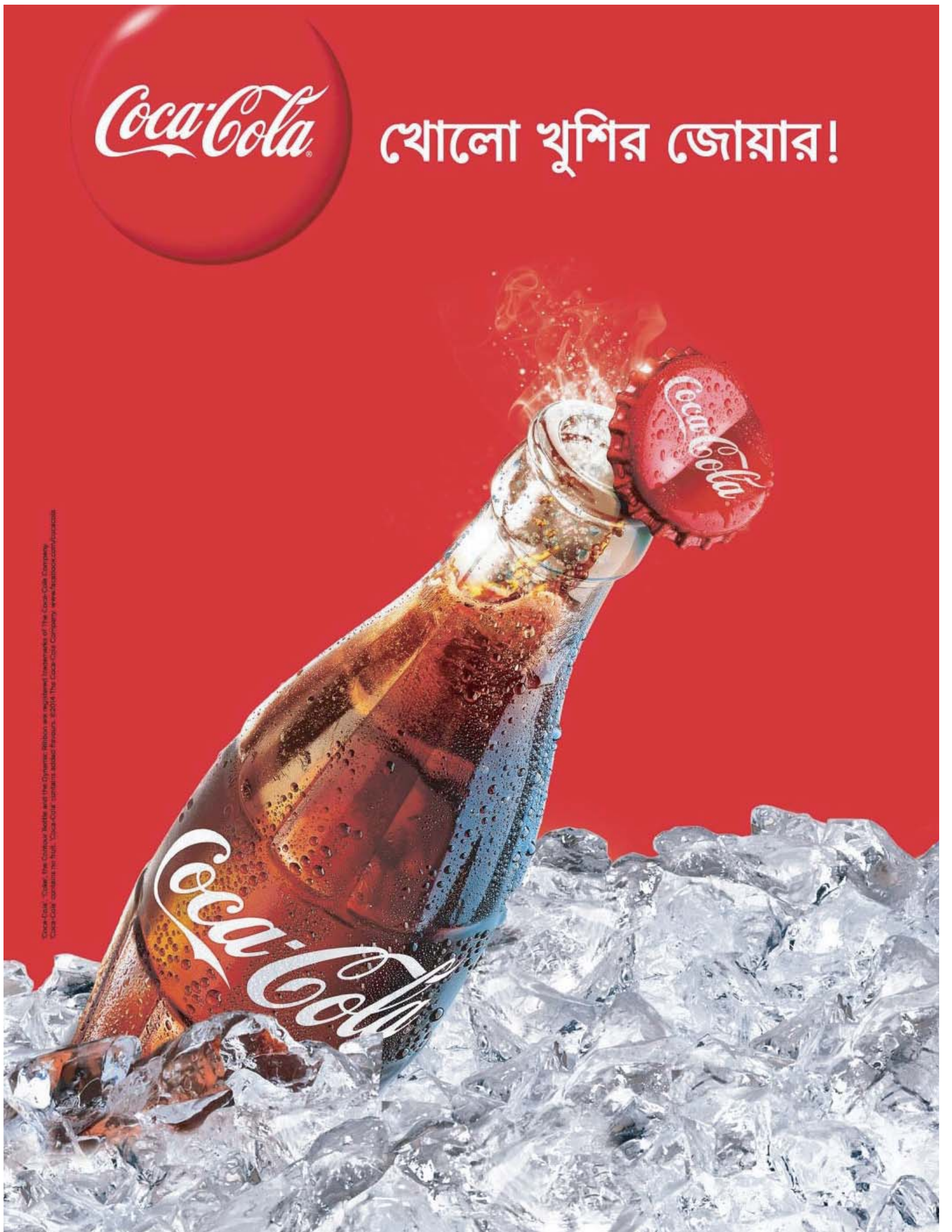
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

সন্ধ্যায় মেয়েকে বাসস্ট্যান্ডে বিদায় দিয়ে একা একা বাড়ি ফেরে জয়নুল। হাস্নুহেনা বলছে, বাজান চিন্তা করবেন না। আমি গার্মেন্টে কাজ করে রোজগার করব। আপনাকে টাকাপয়সা পাঠাব। ধান কাটার সময় আর নিজে খাটনি করবেন না। কামলা রাখবেন।

মেঠোপথে হাঁটতে গিয়ে আনমনা হয়ে যায় জয়নুল মিয়া। মেয়েগুলো ওকে অনবরত স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে যায়। শিউলি সংসারের হাল ধরেছে। নিজের আয়ের টাকা সংসারে ব্যয় করে। নিজের শ্রম দিয়ে সংসারের কাজ সামলায়। বকুল টাকা রোজগার করতে বিদেশে গেছে। বাবার জন্য টাকা পাঠিয়েছে। সেই টাকা কোথায় খরচ হবে তার চিন্তা চলছে। টাকা পাওয়ার আনন্দ শেষ হতে না হতে হাস্নুহেনা ওকে আবার স্বপ্নের ভেতর ঢুকিয়েছে। এত মানুষের এতকিছু পাওয়া হয় এটা বুঝতে ওর একজীবন পার হয়ে গেল। জয়নুল মিয়া দু'হাতে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে, আলাহ্ মাবুদ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে গাছের নিচে দাঁড়ায় ও। এই বাড়িতে রাশিদুনের কত কত বছর কেটেছে। তারপরই ওর দোষে রাশিদুনকে এই বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। কি অপরাধ ছিল ওর? অপরাধতো জয়নুল মিয়ার। ও গাছের কাণ্ড জড়িয়ে ধরে মাথা ঠেকায়। একা একা কাটাতে হল কত বছর! শরীরের জন্য কেউ নেই। মনের জন্যও কেউ নেই। বাজারের মেয়েলোকের ঘরে ঢোকা যায়– সেখানেও ঘেন্না। মন সায় দেয় না। শরীরও না। জয়নুল নিজের দংশনে নিজে পীড়িত হয়। চুল টেনে ধরে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। কতক্ষণ কেটে যায় নিজেও বুঝতে পারে না। ভেসে আসে বয়াতির গান। মৃদুস্বরে গাইছে– দিন যায় দিন যায় জাহাজী।

আমার পরানের গাঙে–। চমকে ওঠে জয়নুল মিয়া। দ্রুতপায়ে সামনে এগোয়। দূর থেকে দেখতে পায় বয়াতী একাই যাচ্ছে। টুংটাং দোতরা বাজছে। বয়াতির সঙ্গে কেউ নেই। জয়নুল মিয়া পেছন থেকে বয়াতির ঘাড়ে হাত রাখে। বয়াতি ঘাড় না ঘুরিয়েই বলে, কে আমার প্রাণের দোসর?

আমি জয়নুল মিয়া।

তুমিতো জীবনের ফাঁকিতে বান্ধা পরান পাখি আমার। কথাটা বলেই হ্মহা ক রে হাসে বয়াতি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসে। যেন এই মুহূর্তে হাসি ছাড়া সে আর কিছু করতে পারবে না। জয়নুল মিয়া বয়াতির হাত চেপে ধরে বলে, এত হাসির কি হইল সাধু? তুমি আমার ফাঁকা জীবন নিয়ে হাসাহাসি কর? তোমার মনে কি দয়ামায়া নাই?

বয়াতি ঘুরে জয়নুল মিয়ার মুখোমুখি হয়? আমার হাসিতো আমার গান! যার জীবনে পাখি থাকে না তারজন্য গান। আর হাসি দুঃখের। আমি তো কাঁদতে পারি না রে সাধু।

কাঁদবা ক্যান? কান্দনের কি হইছে?

কান্দন আসে তোমার বউয়ের জন্য। বেচারি বয়াতি গেয়ে ওঠে, সুখের সংসার থুয়ে। পাখি তুই কোন আকাশে– হাঁটতে হাঁটতে গান গায় বয়াতি। জয়নুল মিয়া তার সঙ্গে যায়। মুখে কথা নাই। বুকে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি। ভাবে এমন গান গেয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া মন্দ না! হাসিও নাই, কান্নাও নাই। দুঃখও নাই সুখও নাই। জগত এক মায়ার খেলা। জয়নুলের খুব ইচ্ছা করে গান গাইতে কিংবা দোতরা বাজাতে কিন্তু কিছুই করতে পারে না। অসহায় মানুষের বিপন্নতা তার ভেতরে কাঁপুনি তোলে। বয়াতির গান থামলে জয়নুল বলে, আমরা তো বাজারেই চলে এসেছি। চল দোকানে বসে চা খাই।

না আমার আস্তানায় চল। দু'জনে গুড়মুড়ি খেয়ে শুয়ে থাকব।

মেয়েরা চিন্তা করবে।

করুক। বাপের জন্য এক রাত জেগে বসে থাকুক। তুমি ওদের জন্মদাতা পিতা– না? এটুকু করতে পারবে না? বয়াতি গম্ভীর মুখে জয়নুলের দিকে তাকায়।

তোমার কি মন খারাপ বয়াতি? তোমার মুখে আজকে সাধুর কথা নাই। চ-ালের কথা শুনতে পাচ্ছি।

বয়াতি আবার হ্মহা ক রে হাসে। হাসি থামায় না। জয়নুল দোকানে ঢুকে গুড়মুড়ি কেনে। দেখতে পায় অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছে বয়াতি। জয়নুল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পরে জয়নুলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, চল যাই। মুড়ি কেনা হয়েছে।

জয়নুল কথা না বলে মুড়ির ঠোঙাটা বয়াতির মুখের ওপর বাড়িয়ে দেয়। বয়াতি মৃদু হেসে বলে, রাগ করেছ? রাগতো হবেই। আমি অনেকক্ষণ সাইদুরের সঙ্গে কথা বলেছি। বায়নার কথা। সাতদিনের জন্য হড়গ্রাম যাব। সাতদিন আসরে বসে গান করব। দু'হাজার টাকা দেবে। এর বেশি পারবে না বলেছে। যা দেয় তাই সই। আমিতো টাকাপয়সা নিয়ে দরদাম করি না। তাহলে আমার গান আর এই দোতারার অসম্মান হয়।

এত প্যাঁচাল পাড় কেন বয়াতি? কে তোমার কথা শুনতে চায়? তুমিতো বায়নায় যাও। আমি তা জানি।

জানবেই তো। তোমাকে যে ইচ্ছা করে দাঁড় করিয়ে রাখলাম সেটা কি তুমি বুঝতে পারলে আমার পরাণ পাখি–

পারব না কেন? একশোবার পেরেছি।

তারপরও তুমি চলে গেলে না যে?

হাস্নুকে বাসে তুলে দিয়েছি। সেজন্য যাইনি। মেয়েটা বাড়িতে নাই তা সইব কি করে।

বুঝতে পেরেছি তোমার মনে খুব দুঃখ জয়নুল মিয়া। কথা বলতে বলতে ঘরের তালা খোলে বয়াতি। বাতি জ্বালায়। গামলায় মুড়ি গুড় ঢালে। মাদুর বিছিয়ে ঘরের মাঝে বসে জয়নুল। বুঝতে পারে খিদে পেয়েছে। কখন ভাত খেয়েছে ভুলে গেছে। বিকেলে কিছু খাওয়া হয়নি। চাবি স্কুটও না। বাড়িতে ফিরলে মেয়েরা যত্ন করত। খেতে দিত। হাস্নুর কথা আলোচনা হত। তার কিছুই হল না। উল্টো একটি ভিন্ন আস্তানায় এসে নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ওখানে পাঁচ মেয়ের সঙ্গে ওদের মা রাশিদুনও আছে।

কি মিয়া খাও না কেন? মুড়ির গামলাতো তোমার সামনে। কথা বলেই বয়াতি গুনগুণিয়ে গায়– ও আমার পরাণ মাঝিরে। পরাণ নিল গাঙচিলে। নীল দুনিয়ায় যাব কেমনে–। গান গাইতে গাইতে জয়নুল মিয়ার মুখোমুখি বসে। জয়নুল মিয়া মুড়ি খেতে পারে না। তাকে ঝিমুনিতে পেয়েছে। মাথা ঝুঁকে যায়।

ও মিয়া, কি হইল?

তুমি খাও বয়াতি। আমার খিদা নাই। বিছানা দাও ঘুমিয়ে যাই।

বয়াতির মায়া হয় জয়নুল মিয়ার জন্য। মুড়ির গামলা সরিয়ে রেখে মাদুরের উপর কাঁথা বিছিয়ে দিয়ে বলে, ঘুমাও। কতকাল ধরে তুমি ঘুমাও না। জয়নুল মিয়া ঘুম খুব মধুর জিনিস। তোমার ঘুমে এখন পোকার কামড় পাওয়া যায়। ঘুণপোকা। অবরত কাটে। কারণ তোমার বিছানায় রাশিদুন নাই।

হ্মহা ক রে হাসে বয়াতি। হাসির শব্দে ঘুম ছুটে যায় জয়নুলের। যে অবসন্ন ভাব শরীরে জড়িয়ে আসছিল, তা কেটে যায়। ভাবে, বয়াতির হাসিতে আনন্দ আছে। গানের মত হাসি। জয়নুল মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বলে, আমি ঘুমাব না। আমি মুড়ি খাব বয়াতি। পেটে খিদে।

আমি তো জানতাম তুমি ঘুমাতে পারবে না। তোমার মেয়ে ঢাকায় গেছে তোমার মন খারাপ। হাত লাগাও। দু'জনে একসঙ্গে গুড়মুড়ি খাই। তুমি আমাকে মাফ করে দিও যে আমি তোমার সঙ্গে অনেক রসিকতা করেছি।

তুমি আমার বন্ধু বলে আমি দিনের আলো চোখে দেখি বয়াতি। নাহলে তো আমার চারদিকে আন্ধার। নিজের ভুলের আন্ধার।

দুই মুঠি মুড়ি খেয়ে জগের পানিটুকু শেষ করে জয়নুল। বুকভরা তৃষ্ণা এই মুহূর্তে ওকে অবদমিত করেছে। ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও ওর চোখের সামনে আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর একবার যদি রাশিদুনকে ফিরে পাওয়া যেত? আর একবার যদি নতুন করে জীবন শুরু করা যেত? জয়নুল মিয়ার চোখে পানি আসে। জগটা হাত উঠিয়ে বলে, টিউবওয়েল থেকে পানি নিয়ে আসি। তোমার তো পানি খেতে হবে।

বয়াতি হাসতে হাসতে বলে, জগের পানির সঙ্গে আবার চোখের পানি মিশিও না কিন্তু মিয়া।

জয়নুল মিয়া উত্তর দেয় না। বাম হাতে চোখ মুছে ঘর থেকে

বেরিয়ে আসে। ঘর থেকে বেশ খানিকটা দূরে টিউবওয়েল। যেতে যেতে গুনগুন করে কাঁদে জয়নুল মিয়া। দু'হাতে চোখ মুছেও নিজেকে সামলাতে পারে না। পাশ থেকে একজন জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে মিয়া? জয়নুল উত্তর না দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটে। লোকটি পিছু ছাড়ে না। কাছে এসে বলে, তোমার কি বউ মরে গেছে? জয়নুল ঘুরে দাঁড়িয়ে জগ দিয়ে বাড়ি মারে লোকটির মাথায়।

আমার কি হয়েছে না হয়েছে তাতে তোর কি হারামজাদা?

কি বললি? হারামজাদা? দেখাচ্ছি মজা।

শুরু হয় দু'জনের হাতাহাতি। কিল্লঘুঁষি। চারপা শে জমে যায় লোক। হই চই শুরু হয়। ওদেরকে থামান হয়। হট্টগোল শুনে বেরিয়ে আসে বয়াতি। ততক্ষণে লোকজন দু'জনকে সরিয়ে দিয়েছে। বয়াতী এসে জয়নুলের পাশে দাঁড়ায়। জয়নুল তখনও ফুঁসছে।

বয়াতি সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা অপর লোকটি তেড়ে উঠে বলে, এই লোকটি কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদ কেন? তোমার কি বউ মরেছে? সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় এলুমিনিয়ামের ওই জগ দিয়ে বাড়ি মারল। আমিও দিলাম দু'চারটে।

কিন্তু ওকে এমন কথা জিজ্ঞেস করাইতো ঠিক হয়নি। ওর তো বউ আছে।

জয়নুল চমকে বয়াতির দিকে তাকায়। অপর লোকটি নাছোড়বান্দা। বলে, তাহলে ও কাঁদছিল কেন?

মেয়ের জন্য। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ঢাকা শহরে গিয়েছে। ওর মনে অনেক দুঃখ। মাসখানেকের মধ্যে ওর একটি মেয়ের বিয়ে হবে। সেই সময় তোমাকে দাওয়াত দিব।

হাসির হুল্লোড়ে মেতে ওঠে সবাই। কেউ একজন বলে, বয়াতি আমাদের জিলাপি খাওয়াও। বিয়ের খবর দিলা। মিষ্টিমুখ করাবা না?

করাব, করাব। চল কেদারের দোকানে যাই। দেখি জিলাপি আছে কিনা।

সবাই হাঁটতে শুরু করলে ভিড়ের মধ্যে থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ে জয়নুল মিয়া। টের পায় তার মাথায় ভেতর ঝোঁ বোঁ শব্দ। বয়াতি দুটো কথা বলেছে। এক. ওর বউ আছে। কেমন করে আছে? সম্পর্কতো শেষ হয়ে গেছে। বেঁচে আছে মাত্র। বউ হয়ে তো আর নাই। ভাবতেই ওর

আবার চোখ ভিজে যায়। দুই. ওর মেয়ের বিয়ে হবে। আগামী এক মাসের মধ্যে বিয়ে। কার বিয়ে? চম্পা না পদ্ম? কার সঙ্গে বিয়ে? কোথায় বাড়ি? জয়নুল মিয়া ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। বয়াতি কেন ওমন কথা বলল আজকে? ও টিউবওয়েল চেপে জগ ভরায়। পানি নিয়ে বয়াতির ঘরের দিকে যায়। ঘুরপথে যায় যেন কারো মুখোমুখি না হতে হয় ওকে। আধো অন্ধকারে গাছের আড়ালে হেঁটে জয়নুল মিয়া জগভর্তি পানি নিয়ে বয়াতির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা খোলা। ও ঘরে ঢুকে দেখতে পায় গামলায় গুড়মুড়ি তখনো আছে। ও বসে পড়ে। জগ রেখে একটু একটু করে গুড়মুড়ি খায়। পাশাপাশি পানি। ভাবতে ভাল লাগে যে বয়াতি আজ ওর মন ভরে দিয়েছে। ওর মনে এখন আর কোন দ্বিধা নেই। আধোঅ ন্ধকারে হেঁটে আসার সময় ওর সব প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। রাশিদুন ওর বউ ছিল। তালাক হয়েছে। তাতে কি, এখন তো ওর বউ আছে। রাশিদুন আর কারো ঘর করেনি। রাশিদুন আমার বউ, আমার বউ– জয়নুল মিয়া খুশিতে নিজের হাঁটু চাপড়ায়। তারপর একমুঠ মুড়ি খায়। বাজারের লোকেরা তো অনেকেই তালাকের কথা জানে কিন্তু কেউ কিছু বলেনি। এটাইতো ওর ভাবনাকে উস্কে দিয়েছে। ওর মনে হচ্ছে রাশিদুন ওর পাশে বসে মুড়ি খাচ্ছে। জয়নুলের মনে হয় ও রাশিদুনকে বলছে, বউ কতদিন বাদে তুমি আর আমি একলগে মুড়ি খাইতাছি। আমাগো সুখের দিনের শ্যাষ হয় নাই। আমরা মরুম একলগে। বউগো–

তখন দরজা খুলে বয়াতি ঢোকে। হাসতে হাসতে বলে, তোমার বউকে কেমন তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি। কেউ একটা কথা বলেনি। থ হয়ে চুপ করে ছিল।

জয়নুল বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, তুমি যদি সত্যি সত্যি দিতে পারতে? তুমিতো গান গেয়েছ দোস্ত্ম। পরাণ পাখির গান–

ওই হল। বয়াতি মুখোমুখি বসে একমুঠি মুড়ি মুখে পোরে। বলে, গানেইতো জীবন উজাড় করে দিলাম। গান আমার প্রার্থনা। তারপর গুনগুনিয়ে শুরু করে, ও পরাণ পাখি তুই খাঁচার ভেতর আয়– আকাশে তোর ঘর নাই। মাটির ঘরে আয়–

তারপর হ্মহা ক রে হেসে জয়নুলের চুল এলোমেলো করে দেয়। জয়নুল চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। আর একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে। কার বিয়ের কথা ভাবছে বয়াতি। চম্পা না পদ্ম? বয়াতি মুড়ি চিবিয়ে বলে, মেয়ের বিয়ের কথা জানতে তোমার পরাণ আইঢাই করছে, না? আমার গানের দলে একটা ছেলে আছে। বাপ্লমা নাই। গ্রামের কথাও জানে না। সিঙ্গিপুরের এক বাড়িতে গরম্ন রাখার কাজ করত। আমার বায়নার শেষে পালিয়ে এসেছে আমার কাছে। বলেছে, আমিও গান গাইতে পারি। শুনে শুনে শিখেছি। চাচা, আপনি আমারে দলে নেন। আমি বললাম, আয়।

তুমি যে বললে, ওর কেউ নেই?

ছোটবেলা থেকে ও পরের বাড়িতে থেকেছে। দশ বছর বয়স পর্যন্ত যে ওকে পেলেছে সে লেখাপড়া শিখিয়েছে। সেই লোক মরে গেলে ও পথেঘাটে ঘুরে খেয়ে না খেয়ে বড় হয়েছে।

জয়নুল মিয়া মিনমিন করে বলে, এমন ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেব? এটা কি হয়?

চম্পা মাতো এমন একটা ছেলেই চায়, যে তোমার বাড়িতে থাকবে। তোমার বাড়ি খালি করে সব মেয়েরা চলে গেলে তোমার কি হবে? সে জন্য তো আমি চম্পা মায়ের কথা ভাবলাম। ছেলেটা যে গান গায় সোনার গলায় গায়। শুনলে মন ভরে যায়। শুনে শুনে গান শিখেছে। ওর কোন ওস্তাদ নাই। ভেবে দেখ জয়নুল মিয়া। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে দেখ ও কি চায়।

জয়নুল মিয়া নিশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা। ছেলেটা কৈ? নাম কি?

নাম বাউলা। আছে অন্যখানে। কাল সকালে আসবে। তুমি আর আমি ওকে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাব। চম্পা দেখবে। দু'জনের পছন্দ হলে বিয়ের দিন ঠিক করবে।

জয়নুল মিয়ার মনে হয় সবটাই স্বপ্নের ঘোর। ওর মাথা ঝিমিয়ে আসে। ঘরের কোনায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে ও। অল্পক্ষণে ঘুম আসে। বয়াতি ওকে নতুন দিন দিয়েছে। কাল থেকে ওর জীবনে নতুন

মেয়েরা কি নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে? বাবার খবর না পেলে ওরা তো তাই করবে। অথচ রাতভর ওদের কথা একটুও মনে আসেনি জয়নুলের। নিজের ইচ্ছেমত রাতযাপন করেছে। মাঝে মাঝে একজন মানুষ তার গণ্ডির বাইরে তো যেতেই পারে। যেটুকু দায়িত্বের বাইরে। তার একদম নিজের। উপভোগের। আনন্দের। গতরাত তেমন একটি রাত ছিল জয়নুলের। বাউলাকে চম্পার জন্য পছন্দ হলে ওটা হবে আরও একটি দারুন রাত– যে রাতে বয়াতি তার একটি মেয়ের বিয়ের কথা বলে সে রাতটি জয়নুলের কাছে স্মরণীয় রাত হয়। ওর এসব ভাবনার মাঝে বয়াতি ঘরে ঢোকে।

দিন শুরু হবে। চম্পার বিয়ে ঠিক হলে ও নিজে গিয়ে রাশিদুনকে এ বাড়িতে আনবে। রাশিদুনের না করা চলবে না।

ভোরবেলা বেশ দেরিতেই ঘুম ভাঙে দু'জনের। কত রাতে দু'জনে ঘুমিয়েছে তা তারা জানে না। অনেক গল্প করেছে। দু'জনের পরিচয়ের দিন থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কত স্মৃতি জমেছিল তার অনেককিছু মনে করে হেসেছে, গল্পের মত বলেছে একজন, অন্যজন শুনেছে। শেষপর্যন্ত দু'জনেই মনে করেছে যে একরাত কথা বলে হবে না। অনেক রাত লাগবে। এক সময় দু'জনে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।

জয়নুল আলস্য ছাড়তে চায় না। সবদিনইতো একরকম করে ওঠা হয়, আজ না হয় অন্যরকম করে উঠবে। অন্যের ঘর অন্যের বিছানা। বাঁশের চেয়ার, ফাঁকফোঁকর দিয়ে বেরিয়ে আসা অন্যরকম আলো। পাখির কিচিরমিচিরের শব্দও একরকম না। বাতাসও কি অন্যরকম? তা হবে। শ্বাস টানলে তো অন্যরকমই লাগছে। ঘরের অন্যপাশ থেকে বয়াতি বলে, তুমি শুয়ে থাক মিয়া। আমি দুইকাপ চা নিয়ে আসি। রাতে যে জিলাপি কিনেছিলাম সেটা আছে ঘরে। আর কিছু মুড়ি নিয়ে আসব। হবে না?

খুব হবে। আমার বাপের জন্মের পুণ্যি হবে। কথা শেষে জয়নুল বালিশে মুখ গোঁজে। এতক্ষণে ওর বাড়ির কথা মনে হয়। মেয়েরা কি নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে? বাবার খবর না পেলে ওরা তো তাই করবে। অথচ রাতভর ওদের কথা একটুও মনে আসেনি জয়নুলের। নিজের ইচ্ছেমত রাতযাপন করেছে। মাঝে মাঝে একজন মানুষ তার গণ্ডির বাইরে তো যেতেই পারে। যেটুকু দায়িত্বের বাইরে। তার একদম নিজের। উপভোগের। আনন্দের। গতরাত তেমন একটি রাত ছিল জয়নুলের। বাউলাকে চম্পার জন্য পছন্দ হলে ওটা হবে আরও একটি দারুন রাত– যে রাতে বয়াতি তার একটি মেয়ের বিয়ের কথা বলে সে রাতটি জয়নুলের কাছে স্মরণীয় রাত হয়। ওর এসব ভাবনার মাঝে বয়াতি ঘরে ঢোকে। সঙ্গে বাউলা। ছেলেটি ঘরে ঢুকেই বসে থাকা জয়নুল মিয়ার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। বয়াতি হাসিমুখে বলে, ও বাউলা। ওর গান শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে তোমার।

জয়নুল মিয়ার খুশির সীমা নাই। ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি কখন এসেছ বাজান? তুমি বাউলা। আমার আর এক জামাইয়ের নাম বাবলা। ওরা ঢাকায় থাকে।

আমার ঢাকায় থাকতে ভাল লাগে না। আমি গ্রামে থাকতে চাই।

বেশ বেশ লক্ষ্মী ছেলে। গ্রামের জলহাওয়া অনেক ভাল। শহরের মত দম আটকানো না।

হয়েছে, এবার তাহমুখ ধুয়ে আস। আমরা চামুড়ি খাব।

জয়নুল মিয়া বাইরে গেলে বয়াতি জিলাপির পোটলা খুলতে খুলতে বলে, মেয়েটিকে তোর পছন্দ হবে বাউলা। বাড়িটাও নিরিবিলি। শান্তিতে থাকবি।

আপনি যে বললেন ও পড়ালেখা জানা মেয়ে। আমিতো পড়ালেখা কম জানি।

তুইতো গান গাইতে পারিস বেটা। ওতো পারে না।

ও কি তা মানবে?

আমার কাছে গানই পড়ালেখা। ও যদি তোকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এসএসসি পাশ করেছ? তুই বলবি গানই আমার পড়ালেখা। এই পড়ালেখা সবাই করতে পারে না। আরও বলবি গান আমি নিজে নিজে শিখেছি। শুনে শুনে শেখা। বয়াতি চাচা বলেন, এমন করে সুর লিখতে খুব কমই ছেলে পারে। পুঁথির বিদ্যা দিয়ে কি হবে? আমি গানের বিদ্যা দিয়েই ভাত

ঘটনাপঞ্জি ❖ জানুয়ারি

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ

০১ জানুয়ারি ১৮৯০ ❖ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯১৪ ❖ অদ্বৈত মল্লবর্মনের জন্ম
০৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু
০৮ জানুয়ারি ১৯০৯ ❖ আশাপূর্ণ দেবীর জন্ম
১০ জানুয়ারি ১৯০৫ ❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ ❖ মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি
১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ ❖ মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯০১ ❖ সুকুমার সেনের জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ ❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯০৫ ❖ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ ❖ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম
২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তর জন্ম
২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ প্রজাতন্ত্র দিবস ॥ ভারতীয় সংবিধান কার্যকর
৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ ❖ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম
৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ ❖ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ॥ শহীদ দিবস

খাব। রোজগারে বাধা হবে না। পারবি না বলতে?

পারব। ও ঘনঘন মাথা নাড়ে। ওর আয়ত চোখের দীপ্তি মুগ্ধ করে বয়াতিকে। বয়াতি ভাবে, ছেলেটি সরল। কিন্তু বুদ্ধি আছে। নিজেকে বড় করার চেষ্টা আছে। ওর কেউ নেই তো তাতে কি? এর চারপাশের লোকেরা ওকে পছন্দ করে। ভালবাসে। বয়াতি এতেও খুশি। হঠাৎ করে মেজাজ গরম হলে কেউ ওকে জাউরা বলে গাল দেয়। ও কি সত্যি একটি জারজ ছেলে? বয়াতির কাছে এর কোন উত্তর নেই। উত্তর ও খুঁজতে চায় না। ছেলেটি ওর সামনে একজন মানুষ। ওর গানের গলা, গায়কী ঢং আর সুর নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এটুকুই অনেক বড়। ওর টানা চোখে আছে নদীর গভীরতা। বয়াতি বলে ওর চোখজোড়া বলেশ্বর নদী। শ্যামলা গায়ের রঙ ওর কাছে সবুজ ধানখেত। ওর তারুণ্যভরা শরীরের দীপ্তি বয়াতির সামনে দেশের মাটি। ওর আর পরিচয়ের দরকার কি? ও নিজেইতো জানে না ওর জন্মের সূত্র। বলে, এতকিছু আমার দরকার নেই। আমার জন্য আপনি আছেন চাচা। আমি এতবড় হলাম তাও তো কেউ না কেউ ছিল। আমার অনেক আপনজন।

সাবাস! তুই বাঁচতে শিখেছিস রে ছেলে! বয়াতি বেশ কিছুক্ষণ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। তখনই বুঝেছিল জন্ম দিয়ে মানুষকে বিচার করা উচিত না। গুণ দিয়ে বিচার করতে হবে। আর মানুষ হিসেবে সম্মান করতে হবে। ওর ভাল নাম আসলাম। বয়াতি ওকে ডাকে বাউলা বলে। ও বলে, আমার অনেক নাম। বিশ্লপঁচিশটা হ বেই। যার কাছে থেকেছি তাকেই বলেছি, আপনি আমাকে একটা নাম দেন। সেটাই আমার নাম হবে। আমার মা কোন নাম রেখেছিল কিনা আমি জানি না।

অনেক সময় বয়াতি হাঁ করে ওর জীবনের গল্প শুনেছে। বুঝে ওঠার বয়স থেকে যে স্মৃতি ওর মধ্যে আছে সেখান থেকে গল্পের শুরু হয়। শেষ হয় বয়াতির গানের দলে যুক্ত হওয়ায় এসে। কত বয়স হবে ওর? কুড়ি না হয় বাইশ? এই বয়সে কত ওর অভিজ্ঞতা! ভেসে আসা এই ছেলেটিকে ডাঙায় তুলতে চায় বয়াতি। ওকে থিতু করতে হবে। বয়াতি ভাঁড় থেকে চা ঢালে। জয়নুল ঘরে ঢোকে। ওর চোখেমুখে পানি। হাতের কনুই পর্যন্ত পানির ছোঁয়া। পায়েও। বাউলা ওকে বয়াতির গামছা এগিয়ে দেয়। জয়নুল নেয় না। বলে, থাক, এমনি এমনি শুকিয়ে যাবে। চা খেলেইতো শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

জয়নুল বয়াতির মুখোমুখি বসে। বয়াতি বাউলাকে ডাক, বাউলা আয়। ও এসে বসলে বয়াতি বলে, তুমি ওর একটা নামি রাখ মিয়া?

নাম? জয়নুল মিয়া ভরু কুঁচকে জিলাপিতে কামড় দেয়। ওর একটা সুন্দর নাম রাখতে হবে। বয়াতি একটা কাজ করলে হয় না? আমার চম্পা মা যদি ওকে পছন্দ করে নামটা আমার চম্পাই রাখবে। ঠিক আছে?

বয়াতি স্মিত হেসে বলে, ঠিক আছে। ভালই চিন্তা করেছ।

ততক্ষণে জিলাপি হাতে ঘরের বাইরে চলে যায় বাউলা। ভাবে, চম্পা যদি পছন্দ না করে তখন কি হবে? কেউ কি ওর নাম রাখবে না? পরক্ষণে সিদ্ধান্ত নেয়, বিয়ে না হলে ওর নতুন নামের দরকার কি? শুধু একটা স্মৃতি হবে। ও টিউবওয়েল চেপে পানি খাওয়ার জন্য চলে যায়।

তখন বয়াতি একই প্রশ্ন করে জয়নুল মিয়াকে। যদি চম্পার পছন্দ না হয় তাহলে ওর একটা নতুন নাম কে রাখবে? ও নিজে নিজের নাম রেখেছে আসলাম। গানের আসরে আমি ডাকি বয়াতি আসলাম।

চম্পা যদি ওকে পছন্দ না করে তাহলে আমি ওর একটা নাম রাখব। আমার মেয়েদের মত ফুলের নামে নাম রাখব।

বয়াতি মৃদু হেসে চায়ে চুমুক দেয়। বাইরে থেকে ভেসে আসে বাউলার গান– দিন গেল, দিন গেল– পরাণ বাঁধা পড়ল না/ পঙ্খিরাজে চড়ে আমার/ ভিনদেশে যাওয়া হল না।

জয়নুল মিয়া কান পেতে শোনে। তারপর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর চেহারা। বয়াতি হাসতে হাসতে বলে, তোমার চেহারায় সুখের রঙ দেখা যাচ্ছে। তোমার মেয়ে বাউলাকে না করবে না।

বাজার থেকে জিলাপি কিনে তিনজনে বাড়ির পথে রওনা দেয়। প্রত্যেকের বুকের ভেতর একই রকম চাপা উল্লাস। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সুখবর ছড়িয়ে যাবে বাড়ির সবখানে– বয়াতীর এমনই ধারণা। মেয়েটি পছন্দ করবে বাউলাকে– ওর জন্য একটি ফুলের নাম রাখবে– এমনই ধারণা জয়নুল মিয়ার। আর বাউলা নিজেকে নিয়ে দিশেহারা– ওর জীবন এত খুশির খবরে ভরে উঠবে, এমন ধারণাই ওর ছিল না। এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে যে জন্মের সময় ওর চারদিকে ফুলের গন্ধ ছিল। তিনজনে দ্রুতপায়ে হাঁটে। জিলাপির পোটলা জয়নুল মিয়ার হাতে। সবাই দেখতে পায় বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তিন মেয়ে। বাজানকে দেখে কেউই ছুটে আসে না। বাউলার হাত ধরে বয়াতি পিছিয়ে থাকে। মেয়েদের কাছে এগিয়ে যায় জয়নুল। বলে, তোমাদের জন্য দুইটা খুশির খবর আছে মা! শিউলি গম্ভীর স্বরে বলে, কি খবর বাজান?

খুশির খবর এই যে তোমাদের জন্য জিলাপি এনেছি। তোমরা জিলাপি খেতে ভালবাস। জয়নুলের হাত থেকে পোটলাটা শিউলি নেয়। চম্পা ও গম্ভীর স্বরে বলে, আর একটা খুশির কবর কি?

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

বাংলাদেশভারত মৈত্রী সমিতি
হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

BANGLADESH-BHARAT SAMPRITEE PARISHAD
বাংলাদেশভারত স ম্প্রীতি পরিষদ
নাহার প্লাজা, ৯ম তলা, ২৬ সোনারগাঁও রোড
ঢাকা১০০০, বাংলা দেশ
ফোন: ০১৬৭৬ ০৪৮৫৭২
ই মেইল
bangladesh-bharat-sampriti@yahoo.com
ওয়েবসাইট: http://www.shampritee.org

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India
ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

স্কেচ বিজন চৌধুরী

অনুবাদ গল্প

গুণ্ডা

জয়শঙ্কর প্রসাদ

পঞ্চাশের ওপর বয়েস, কিন্তু যুবার চেয়ে বলিষ্ঠ ও সবল। এখনও গায়ের চামড়া কোঁচকায়নি। শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারায়, পৌষের হাড় কাঁপানো শীতে, জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা রোদে– সব সময়েই খালি গায়ে বেড়াতে সে ভালবাসে, ছুঁচলো গোঁফজোড়া দর্শকদের চোখে বিছের হুলের মত ফোটে। চিক্কণ শ্যামবর্ণ, ঠিক যেন সাপের গা। পরনে লাল রেশমী পাড়ওয়ালা নাগপুরী ধুতি, দূর থেকেই নজরে পড়ে। কোমরে বেনারসী সিল্কের কোমর্‌বন্ধ, তাতে বিছের মত ঝিনুকের একটা গাঁইট। একরাশ কোঁকড়ান চুল, মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর সোনালি প্রান্তটা বিছিয়ে থাকে পিঠজুড়ে। প্রশস্ত কাঁধে ধারাল কুড়ুল– ওর হাতিয়ার। সদর্পে চলার সময় দেহের শিরাউপশিরা গুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সেই গুণ্ডা।

আঠারশো শতকের শেষভাগে কাশীর রূপ পাল্টে যায়। এখানে উপনিষদের অজাতশত্রুর সভায় ব্রহ্মবিদ্যা শেখার জন্যে বিদ্বান ব্রহ্মচারীরা আর আসে না। শতাব্দীধরে মঠ ও মন্দিরের ধ্বংসলীলা চলেছে। হত্যা করা হচ্ছে সাধুসন্ন্যাসী ও তপস্বীদের। তাই কাশীতে আর গৌতম বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের ধর্মদর্শন নিয়ে বাদানুবাদ হতে দেখা যায় না। অনাহূত নতুন ধর্মের দাপটে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। অস্ত্রবলের কাছে ন্যায় ও মুক্তির মৃত্যু হতে দেখে কাশীর হতাশ ও বিচ্ছিন্ন নাগরিকদের মধ্যে একটা নতুন দল গড়ে উঠতে দেখা যায়– যারা বাহুবলে বিশ্বাসী। যারা কথার মর্যাদা রাখতে প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এরা বাহুবলে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রাণভিক্ষার্থী কাপুরুষকে কিংবা আহত প্রতিদ্বন্দ্বীকে এরা কখনও স্পর্শ করত না। পীড়িত ও দুর্বলদের সাহায্য করত! সব সময় হাতে প্রাণ নিয়ে এদের বিচরণ। কাশীর লোকেরা এদেরই গুণ্ডা বলে জানত।

জীবনের ঈপ্সিত বস্তু না পেলে মানুষ নিস্পৃহ হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদারের ছেলে ননহকু সিং কোনও মানসিক আঘাতে গুণ্ডা হয়ে যায়। দু'হাতে নিজের সব ধনসম্পত্তি বিলিয়ে দেয়। টাকা নিয়ে নয়ছয় ক রে নন্‌হকু সিং ভাঁড়ের নাচ দেখিয়েছিল, কাশীর লোকে আজও তা ভুলতে পারেনি। তখনকার দিনে বসন্তকালে এইসব প্রহসন দেখাতে প্রচুর অর্থ, লোকবল সাহস ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রয়োজন হত। একবার নন্‌হকু সিং নিজেও অভিনয় করেছিল। এক পায়ে নূপুর ও এক হাতে তোড়া। এক চোখে কাজল ও এক কানে দামী মুক্তা। অন্য কানে ছেঁড়া জুতো ও অন্য হাতে জড়োয়া কাজ করা তলোয়ারের মুঠ। আপাদমস্তক গয়নায় মোড়া অভিনয়কারী প্রেমিকার কাঁধে হাত রেখে গেয়েছিল:

'কঁহী বৈগনওয়ালী মিলেতো বুলা দেনা।' অর্থাৎ যদি কোথাও বেগুনওয়ালীর দেখা পাও তো ডেকে দিও।

প্রায়ই বেনারসের শহরতলীর খেতুখামা রে খাবার জলের পাতকোর পাড়ে, গঙ্গার বুকে নৌকায় তাকে দেখতে পাওয়া যেত। জুয়াড়ীর আড্ডা ছেড়ে সে চকে এলে কাশীর চটকদার বেশ্যারা তাকে হেসে অভ্যর্থনা জানাত। তার বলিষ্ঠ দেহের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। সে শুধু পানওয়ালার দোকানে বসে ওদের গান শুনত, কখনও দোতলায় ওদের ঘরে যেত না। জুয়ার টাকা এইসব বেশ্যাদের ঘরের দিকে মুঠো করে ছুঁড়ে ফেলত। বেশ্যাদের ঘরে বসে থাকা লোকগুলোর মাথায় কখনও কখনও সে টাকা লাগত আর নন্‌হকু সিং হাসিতে ফেটে পড়ত। তাকে দোতলায় ওদের ঘরে যাবার কথা বললে সে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে যেত।

বংশীর জুয়ার আড্ডা থেকে নন্‌হকু বেরিয়ে আসে। আজ হেরে সর্বস্বান্ত, বেশ্যাদের নাচগান আজ আর ভাল লাগে না। সে মন্নু পানওয়ালার দোকানে এসে বসে। বলে– 'দিনটা আজ মোটেই সুবিধের নয়।'

'কেন হুজুর! চিন্তা কিসের? আমরা তো আছি। আপনারই তো সব।'

'তুই দেখছি নেহাত বোকাই রয়ে গেলি। নন্‌হকু সিং টাকা ধার করে যেদিন জুয়া খেলবে সেদিন জানবি এই নন্‌হকু সিং মরে গেছে। আমি কখন জুয়া খেলতে যাই তুইতো জানিস না। পকেটে যখন একটা পয়সাও থাকে না তখন জুয়ার আড্ডায় হাজির হই। গিয়েই যেদিকে টাকা বেশি সেদিকেই ভিড়ে পড়ি। বাজী ধরি আর দাও মারি। এটা বাবা কিনারামের আশীর্বাদ।

'তবে আজ কেন এরকম হল, হুজুর?'

'প্রথম বাজী ঠিকই জিতেছিলাম, কিন্তু পরের দু'চার দান খেলতে গিয়ে সব বেরিয়ে গেল। মোটে এই টাকা পাঁচটা বেঁচেছে। পানের জন্যে একটা টাকা রেখে দে, আর চারটে টাকা মলুকী কথককে দিয়ে দে, আর ওকে বল, দুলারী যেন গান গায়। হ্যাঁ, সেই গানটা–'

'...বলম্ বিদেশ রহে' অর্থাৎ প্রিয়তমা বিদেশেই রয়ে গেল।

মলুকী গাঁজার কলকের কয়লা ঠিক করছিল। নন্‌হকু সিংএর কথা শুনে হড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে যায়। নজর গাঁজার কলকের দিকে। তাই যেতে যেতে হোঁচট খায়। এতে কিছু এসে যায় না, নন্‌হকু সিংএর ভ্রূকুটি সহ্য করা তার পড়ো অসম্ভব। ভ্রূকুটির চেয়ে পড়ে গিয়ে চোট খাওয়াও শ্রেয়। আজও তার নন্‌হকু সিংএর সেই চেহারা স্পষ্ট মনে আছে। জুয়ায় জিতে এসে নন্‌হকু সিং টাকায় ভর্তি থলেটা নিয়ে এই পানওয়ালার দোকানেই বসেছিল। বরযাত্রী যেতে দেখে প্রশ্ন করেছিল, 'কাদের বর?'

'ঠাকুর বোধী সিংএর ছেলের বিয়ে।' ...মন্নুর কথা শেষ হবার আগেই, নন্‌হকুর ঠোঁট রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

'মন্নু এ কিছুতেই হবে না। এ পথ দিয়ে আজ বরযাত্রী যাবে না। বোধী সিং আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবেই এ পথ দিয়ে বর নিয়ে যেতে পারবে।'

মন্নু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, 'হুজুর, তা আমি কি করতে পারি?'

নন্‌হকু কাঁধের কুড়ুলটা উঁচিয়ে মলুকীকে একটু কড়তে দিয়ে বলল, 'মলুকিয়া, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, এক্ষুণি যা, ঠাকুর বোধী সিংকে বল, নন্‌হকু সিং এখানে দাঁড়িয়ে আছে দাও মারার জন্যে। একটু বুঝে সুঝে যেন এগোয়, ছেলের বিয়ে।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মলুকিয়া ঠাকুর বোধী সিংএর কা ছে হাজির হল। গত পাঁচ বছর যাবৎ বোধী সিং আর নন্‌হকুর মুখ দেখাদেখি নেই। একবার জুয়ার আড্ডায় এদের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। আর পাঁচজনে এসে এদের ঝগড়া মেটায়। সেই থেকে কেউ কারুর মুখ দেখেনি। আজ নন্‌হকু প্রাণের মায়া ত্যাগ করে একা পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। বোধী সিং নন্‌হকুর রোখটা বুঝতে পারে। মলুকীকে বলে, 'এই বেটা, গিয়ে বাবুসাহেবকে বল, আমি কি করে বুঝব যে বাবুসাহেব ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন। যখন উনি স্বয়ং হাজির, তখন দু'জন বরকর্তার কি দরকার।'

বোধী সিং ফিরে গেলে। মলুকীর কাঁধে টাকার থালিটা চাপিয়ে দিয়ে বাজনার সামনে গিয়ে নন্‌হকু বর নিয়ে এগুলো। বিয়ের সমস্ত খরচাই নন্‌হকু করল। পরের দিন বরুক নেকে সঙ্গে নিয়ে এই দোকানের সামনে এসে বরুক নে ও বরযাত্রীকে বোধী সিংএর বাড়ি তে পাঠিয়ে দিলে, নিজে আর এগুলো না।

মলুকিয়াও সেদিন দশটা টাকা পেয়ছিল। নন্‌হকু সিংএর কথা না শুনলে মৃত্যু যে অবধারিত, মলুকিয়া তা ভাল করেই জানে। তাই ভয়ে ভয়ে দুলারীকে বলে, 'তুমি গান ধর, আমি তবলায় ঠেকা দিচ্ছি, ততক্ষণে বল্লভ সারেঙ্গীওয়ালা জল খেয়ে এসে পড়বে।'

'ব্যাপার কি, বিপদ্নআপদ কিছু ঘটল নাকি? ' দুলারী জানলা খুলে দেয়। মুচকি হেসে নন্‌হকু সিংকে সেলাম জানায়। নন্‌হকুও অভিবাদনে সাড়া দিয়ে এক অপরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অপরিচিত মানুষটির হাতে পাতলা লিকলিকে ছড়ি, চোখে সুর্মা, একগাল পান, মেহেদি লাগানো লাল দাড়ি। লালা দাড়ির গোড়ায় সাদা ছোপ। মাথায় ছুঁচোলো টুপি, গায়ে ছ'কাটের জামা। সঙ্গে কাঁধে বেল্টআঁটা দু'জন সিপাই। মৌলবি বলেই মনে হয়। নন্‌হকু একটু হাসে। নন্‌হকুর দিকে না তাকিয়ে মৌলবি সাহেব সিপাইদের একজনকে হুকুম দেন, 'যাও দুলারীকে গিয়ে বল, আজ রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়িতে গান্ন

বাজনা হবে, যেন এক্ষুণি চলে আসে। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ জান আলীর দোকান থেকে খানিকটা আতর কিনে নিয়ে আসি।' সিপাই ওপরে উঠে যায়। মৌলবিজি অন্যদিকে পা বাড়াল। নন্‌হকু বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'দুলারী, আর কতক্ষণ বসে থাকব? সারেঙ্গীওয়ালা কি এখনও আসেনি?'

দুলারী জবাব দেয়, 'বারে বাবুসাহেব, আপনার জন্যেই এখানে এসে বসলাম, গান শুনুন না। আপনি তো কখনও ওপরে...' কথা শুনে মৌলবি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। সিপাইকে হাঁক দেয়, 'এখনও হারামজাদী নামল না? যা কোতোয়ালকে আমার নাম করে বল, মৌলবি আলাউদ্দিন কুবরা তাকে তলব করেছে। এই ছুঁড়ির একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। নবাবরা চলে যাবার পর থেকে এই কাফেরদের বড্ড বাড় বেড়েছে।'

কুবরা মৌলবি। বাপরে... পানওয়ালা নিজের দোকান সামলাতে লাগল। পাশের দোকানে এক বেনিয়া ঢুকছিল। শব্দে চমকে গিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে চোট খেল।

এই মৌলবিই তো মহারাজ চেতসিংএর কাছ থেকে সাড়ে তিন সের পিঁপড়ের মাথার তেল চেয়েছিল।

মৌলবি কুবরাকে নিয়ে বাজারে বেশ সোরগোল পড়ে যায়। নন্‌হকু সিং মন্নুকে বলল, 'চুপচাপ কেন, বসবে না?' তারপর দুলারীকে বলে, 'ওখান থেকেই গান শুরু করো বাঈজী, এদিক ওদিক যাবার দরকার নেই। এইরকম ঘেসেড়ে অনেক দেখেছি। দু'দিন আগে রুমাল বিছিয়ে পয়সা ভিরুে করেছে, আজ এসেছে রোয়াব দেখাতে!'

কুবরা নন্‌হকুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'এ পাজীটা কে?'

'তোমার খুড়ো, বাবু নন্‌হকু সিং', আর সঙ্গে সঙ্গেই টেনে একটা বেনারসী চড়।

কুবরার মাথা ঘুরে যায়। বেল্টআঁটা সেপাই দুটো উল্টোমুখো ছুট দেয়। মৌলবি সাহেব চড় খেয়ে চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগলেন। টলতে টলতে কোনরকমে জান আলীর দোকানে গিয়ে পৌঁছলেন।

'মৌলবি সাহেব, আপনিও ওই গুণ্ডার সঙ্গে বচসা করতে গেলেন? এই রক্ষে যে কুড়ুল তুলে মারেনি', জান আলী বলে। কুবরার মুখ দিয়ে কথা সরে না। '...বলম বিদেশ রহে', গানটা শেষ হল। কেউ এলও না, কেউ গেলও না। নন্‌হকু সিং আস্তে আস্তে অন্য দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে রেশমী কাপড়ে ঢাকা একটা পালকী এসে দাঁড়াল। সঙ্গে চৌবেদার এসেছে। দুলারীকে রাজমাতার আদেশ জানাল।

দুলারী চুপচাপ পালকীতে উঠে বসে। সন্ধ্যেবেলার ধুলো আর ধোঁয়ায় ভরা কাশীর সরু গলির ভেতর দিয়ে পালকী শিবালয় ঘাটের দিকে এগিয়ে চলে।

দুই.

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। রাজমাতা পান্না শিবালয়ে পুজো করছিলেন। দুলারী বাইরে বসে আরও কয়েকজন গায়িকার সঙ্গে ভজন গাইছিল। আরতি শেষ হতে গলায় আঁচল দিয়ে করজোড়ে পান্না ঠাকুরপ্রণাম করেন। প্রসাদ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দুলারীকে দেখতে পেলেন। দুলারী উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, 'আমি অনেক আগেই এসে পৌঁছতাম। কিন্তু কি করব, মুখপোড়া সেই কুবরা মৌলবি রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিল। এই হুজ্জতে অনেকটা সময় নষ্ট হল রানীমা।'

'কুবরা মৌলবি! যেখানে যাই তারই কথা শুনি। কানে এল সে এখানে এসেও কিছু নাকি...' হঠাৎ কি মনে করে কথা পালটে পান্না বললেন, 'হাঁ, তারপর কি হল? তুমি এখানে এলে কি করে?'

'বাবু নন্‌হকু সিং এসে পড়ায় তাকে আমি সব বললাম। পুজোয় আমাকে ভজন গাইতে রাজমাতা ডেকে পাঠিয়েছেন, আর এ আমায় যেতে দিচ্ছে না। মৌলবিকে তিনি এমন টেনে একটি চড় কশালেন যে কুবরা বাপের নাম ভুলে গেল। তাই এখানে আসতে পেলাম।'

'বাবু নন্‌হকু সিং? সে আবার কে?'

মাথা হেঁট করে দুলারী বলল, 'রানীমা কি তাকে চেনেন না? বাবু নিরঞ্জন সিংয়ের ছেলে। মনে পড়ে, সেই ছোটবেলায় আমি একদিন আপনার বাগানে দুলছিলাম আর নবাবের হাতি ক্ষেপে গিয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছিল। সেদিন বাবু নিরঞ্জন সিংয়ের ছেলেই তো আমাদের বাঁচিয়েছিল?'

পুরনো ঘটনা শুনে রাজমাতার মুখ কেন মলিন হয়ে গেল, তা বোঝা গেল না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'তা বাবু নন্‌হকু সিং ওধারে কেন গিয়েছিলেন?'

একটু হেসে দুলারী মাথা নিচু করে নিল। রাজমাতা পান্নার বাপের জমিদারীতে যে বেশ্যা থাকত দুলারী তারই মেয়ে। ছোটবেলায় পান্না তার সঙ্গে অনেক খেলাধুলো করেছেন। দুলারীর গলা ছোটবেলা থেকেই বেশ সুরেলা। দেখতে সুন্দরী আর চঞ্চল। পান্না এখন কাশীর রাজমাতা আর দুলারী কাশীর নামকরা গায়িকা। রাজদরবারে প্রায়ই সে গান করে। মহারাজ বলবন্ত সিংএর সময় থেকেই গানবাজনা পান্নার জীবনের একটা অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন প্রেম, দুঃখ, দরদভরা বিরহের গানের প্রতিই পান্নার ঝোঁক ছিল। এখন সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ ভজন গান হয়। রাজমাতা পান্নার শান্ত দীপ্ত মুখমণ্ডলে বৈধব্যের ছায়া পড়েছে।

বড়রানীর সতীনের জ্বালা বলবন্ত সিংয়ের মৃত্যুর পরেও মেটেনি। অন্দরমহলে তাঁরই দাপট। তাই মনের জ্বালা মেটাতে পান্না প্রায়ই কাশীর রাজমন্দিরে এসে পুজোপাঠের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখেন। রামনগরে তিনি শান্তি পেতেন না। নতুন রানী ও বলবন্ত সিংয়ের প্রেয়সী হবার গৌরব তাঁর ছিলই, মাতৃত্বের গৌরবও তাঁরই প্রাপ্য। অসবর্ণ বিয়ের সামাজিক কলঙ্ক তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করত। বিয়ের পর তাঁকে কম কথা শুনতে হয়নি। সব মনে পড়ে যায়।

গঙ্গার ধারে চাতালের ওপর বসে পান্না অন্যমনস্কভাবে গঙ্গার ঢেউয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। অতীতের কথা ভেবে আর কোনও লাভ নেই। স্মৃতির গর্ভে আজ সে সব তলিয়ে গেছে। তার ভাল মন্দে আর কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষ সব কিছুরই হিসেব মেলাবার চেষ্টা করে। আর কখনও কখনও আপন মনে প্রশ্ন করে, 'যদি তা ঘটত, তাহলে কি হত?'

পান্নাও তাই ভাবছিলেন, এক সম্ভাবনার কথা। রাজা বলবন্ত সিং জোর করে বিয়ে না করলে তাঁর জীবনের মোড় হয়তো ঘুরে যেত। নন্‌হকু সিংয়ের নাম শোনার পরই এত কথা মনে পড়ল। গ্যাঁদা ছিল তাঁর দাসী। সব ব্যাপারেই সে ফাড়ন কাটত। পান্না যেদিন বলবন্ত সিংয়ের প্রেয়সী হলেন, সেদিন থেকেই গ্যাঁদা তাঁর ছায়া। রাজ্যের সমস্ত খবরাখবর উনি তার কাছেই পেতেন। কত খবরই না ও রাখত। দুলারীকে একটু অপদস্থ করবে মনে করে সে বলে, 'মহারানী! নন্‌হকু সিং ভাঁড়ের নাচ দেখিয়ে, মোষের লড়াই, ঘোড়দৌড় আর গানবাজনা করেই তার সমস্ত জমিদারী উড়িয়ে এখন ডাকাত হয়েছে। যেখানে যত খুন হয় সবেতেই তার হাত থাকে। যত...' তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই দুলারী প্রতিবাদ করে ওঠে, 'এসব বাজে কথা।

রাজমাতা পান্নার বাপের জমিদারীতে যে বেশ্যা থাকত দুলারী তারই মেয়ে। ছোটবেলায় পান্না তার সঙ্গে অনেক খেলাধুলো করেছেন। দুলারীর গলা ছোটবেলা থেকেই বেশ সুরেলা। দেখতে সুন্দরী আর চঞ্চল। পান্না এখন কাশীর রাজমাতা আর দুলারী কাশীর নামকরা গায়িকা। রাজদরবারে প্রায়ই সে গান করে। মহারাজ বলবন্ত সিংএর সময় থেকেই গানবাজনা পান্নার জীবনের একটা অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন প্রেম, দুঃখ, দরদভরা বিরহের গানের প্রতিই পান্নার ঝোঁক ছিল।

বাবুসাহেবের মত এরকম ধর্মপ্রাণ লোক আর হয় না। কত শত বিধবা তাঁর দেওয়া কাপড় দিয়ে লজ্জা নিবারণ করছে। কত মেয়ের বিয়ে তিনি দিয়েছেন। কত লাঞ্ছিতকে তিনি লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।'

রানী পান্নার হৃদয় করণায় ভরে যায়। তিনি একটু হেসে দুলারীকে বললেন, 'উনি বুঝি তোর ওখানে আসেন! তাই বুঝি তুই ওঁর প্রশংসায়...'

'না রানীমা। দিব্বি গেলে বলছি, বাবু নন্‌হকু সিং আজ পর্যন্ত কখনও আমার ঘরে পা দেননি। বোঝা গেল না এই অদ্ভুত লোকটিকে জানবার জন্যে রাজমাতা এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন। দুলারী যাতে আর কিছু না বলে সে জন্যে তিনি তার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলেন। দুলারীও আর কিছু বলল না। ভোরের সানাই বাজতেই দুলারী বিদায় নিয়ে পালকিতে এসে বসল। গ্যাঁদা রানীমাকে শুনিয়ে বলতে লাগল– 'দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। কত জায়গায় যে জুয়া খেলে লোকেরা তাদের সর্বস্ব হারাচ্ছে তার ঠিকঠিকানা নেই। বাচ্চাদের ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। গলিঘুঁজিতে কথায় কথায় ছুরি লাঠি চলে। ওদিকে রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গেও মহারাজের তেমন বনিবনা হচ্ছে না।' শুনে রাজমাতা চুপ করে থাকেন।

পরের দিন রাজা চেতসিংয়ের কাছে রেসিডেন্ট ম্যাকহেম সাহেবের চিঠি আসে। চিঠিতে শহরের দুরবস্থা নিয়ে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। ডাকাত আর গুণ্ডাদের ধরপাকড় করার ও তাদের প্রতি কড়া নজর রাখার আদেশ এসেছে। মৌলবি কুবরার ঘটনারও উল্লেখ আছে। হেস্টিংস সাহেবের আসার খবরও রয়েছে। শিবালয় ঘাটে ও রামনগরে হই চই পড়ে গেছে। যার হাতে লাঠি, লোহার মাথাওয়ালা ডাণ্ডা, কুড়ুল, কাটারি বা ছোরা দেখতে পেল, কোতোয়াল হিম্মত সিং পাগলের মত তাদের ধরপাকড় করতে লাগল।

নন্‌হকু সিং তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে সুম্মা ও খালের সঙ্গমে একটা সবুজ ঘাসের ঢিপির ওপর বসে ভাঙ ছাঁকছিল। গঙ্গায় ওর সরু ডোঙাটা বটগাছের ঝুরির সঙ্গে বাঁধা ছিল। সঙ্গে চারণ গানও চলছিল। চারটে এক্কাগাড়ি জোতা ছিল।

নন্‌হকু সিং হঠাৎ বলে উঠল, আরে মলুকী। গানতো মোটেও জমছে না। ডাকঘরের এই একটা এক্কাগাড়ি নিয়ে দুলারীকে ডেকে আন।' মলুকী খঞ্জনি বাজাচ্ছিল। দৌড়ে এক্কাগাড়িতে গিয়ে বসল। নন্‌হকু সিংয়ের মনটা আজ ভাল নেই। এতবার করে ছেঁকে খেয়েও ভাঙের নেশা হচ্ছে না। একঘণ্টার মধ্যে দুলারী সামনে এসে হাজির। দুলারী একটু হেসে প্রশ্ন করল, 'কি হুকুম, বাবুসাহেব।'

'দুলারী, আজ গান শুনতে ইচ্ছে করছে।'

কি ব্যাপার জানবার জন্যে দুলারী ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'তা এই বনবাদাড়ে কেন?'

'ভয়ের কিছু নেই,' নন্‌হকু সিং একটু হেসে জবাব দেয়।

'এই কথাই তো আমি সেদিন মহারানীকেও বলে এসেছি।

'কি বললি,... কাকে?'

'রাজমাতা পান্নাদেবীকে...'

সেদিন গান আর জমল না। দুলারী লক্ষ্য করল গান শুনতে শুনতে নন্‌হকু সিংয়ের চোখ জলে ভরে আসছে। গান বাজনা থেমে যায়। বর্ষার রাতে ঝোপ ঝাড়ে ঝিঁঝিঁর একটানা সুর। মন্দিরের কাছে ছোট্ট একটা ঘরে নন্‌হকু সিং গভীর চিন্তায় বিভোর। তার চোখে ঘুম নেই, বাকী সবাই শুয়ে পড়েছে। দুলারীও জেগে আছে। ভাবনা যেন তাকেও পেয়ে বসেছে। অনেক করে আজ নিজেকে দুলারী সামলে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। আস্তে আস্তে নন্‌হকু সিংয়ের কাছে এগিয়ে যায়। হঠাৎ শব্দে চমকে উঠে নন্‌হকু সিং পাশ থেকে তলোয়ারটা উঠিয়ে নিল। দুলারী একটু হেসে বলল, 'বাবুসাহেব, এ কি ব্যাপার? মেয়েদের ওপরেও কি তলোয়ার চালাবে?'

ছোট প্রদীপের আলোয় কামনাদীপ্ত রমণীর মুখ দেখে নন্‌হকু হেসে উঠল। 'কি বাঈজী, তোমাকে কি এই সময়েই যেতে হবে? মৌলবি কি ডেকে পাঠিয়েছে?' দুলারী নন্‌হকুর পাশে গিয়ে বসে পড়ল। নন্‌হকু প্রশ্ন করে, 'ভয় করছে নাকি?'

'না, আমি একটা কথা জানতে চাই।'

'কি?'

'কি... জিগ্যেস করছ... এই কথা... তোমার হৃদয়ে কি কোনদিন...।'

'সে কথা থাক দুলারী। হৃদয়টৃদয় সব বেকার। ওটাকে আমি হাতে নিয়েই বেড়াই। ভাবি কেউ যদি এই হৃদয়টাকে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। মরতে তো কত চেষ্টাই না করছি, কিন্তু পারছি কই।'

'মৃত্যুকে আবার খুঁজে বেড়াতে হয় নাকি? কাশীর যে কি অবস্থা তার খবর কি আপনি রাখেন? নিমেষের মধ্যে যে কি ওলোটপালট হয়ে যাবে তা ভাবাই যায় না। বেনারসের গল্লিঘুঁজি সব যেন গিলতে আসছে।'

'নতুন কিছু ঘটেছে নাকি রে?'

'কোন এক হেস্টিংস সাহেব এসেছেন। শুনেছি শিবালয় ঘাটে ইংরেজ কোম্পানি দিশি সিপাইদের পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। রাজা চেতসিং আর রাজমাতা পান্না এখানে নেই। কেউ কেউ বলছে ওদের দু'জনকে নাকি প্রেপ্তার করে কলকাতায়...'

'পান্না ও... রানীদের বাসও ওখানে?' নন্‌হকু অধীর হয়ে প্রশ্ন করে।

'রানী পান্নার কথা শুনে আজ আপনার চোখে জল কেন, বাবুসাহেব?'

হঠাৎ নন্‌হকুর মুখের চেহারা অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠল। তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠল– 'চুপ কর, সে কথা শুনে তোর লাভ কি?'

নন্‌হকু উঠে দাঁড়াল। ব্যস্ত হয়ে কিছু খুঁজতে লাগল। পরে একটু শান্ত হয়ে বলল– 'দুলারী, জীবনে আজ এই প্রথম আমার খাটে বসে আছে একটি মেয়ে গভীর রাতে। আমি চিরকুমার, শুধু একটি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জনে কত শত সহস্র অন্যায় আর অপরাধ করে চলেছি। কিন্তু কেন? তা তুমি জান? আমি নারী জাতির বিরুদ্ধ। আর পান্না!... তবে তারই বা কি অপরাধ? আমি অত্যাচারী বলবন্ত সিংয়ের বুকে তো ছুরি বসাতে পারলাম না। কিন্তু পান্না! ওকে ধরে গোরারা কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে... সেখানে...।'

নন্‌হকু সিং পাগলের মত ছটফট করতে থাকে। দুলারী তাকিয়ে দেখল নন্‌হকু বটগাছের কাছে গিয়ে অন্ধকারে গঙ্গার ঢেউয়ের বুকে ডোঙা ভাসিয়ে দিল। ভয়ে দুলারী কাঁপতে থাকে।

তিন.

১৭৮১ সালের ১৬ আগস্ট, কাশীতে মহা ডামাডোল পড়ে গেছে। শিবালয় ঘাটে রাজা চেতসিং লেফ্‌টেন্যান্ট হস্টাকরের নজরবন্দী হয়েছেন। সারা শহরে একটা সন্ত্রাসের ভাব। সমস্ত দোকানপাট ব ন্ধ। ঘরে ঘরে ছেলেরা মাকে জিগ্যেস করে, 'আজ হালুয়াওয়ালা আসেনি?; উত্তরে মা ধমক দিয়ে ওঠেন। বলেন, 'চুপ কর বাবা!' সারা শহর নিস্তব্ধ। মাঝে মধ্যে কুবরা মৌলবিকে ইংরেজদের দিশি সৈন্যদের আগে আগে যেতে আসতে

পরের দিন রাজা চেতসিংয়ের কাছে রেসিডেন্ট ম্যাকহেম সাহেবের চিঠি আসে। চিঠিতে শহরের দুরবস্থা নিয়ে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। ডাকাত আর গুণ্ডাদের ধরপাকড় করার ও তাদের প্রতি কড়া নজর রাখার আদেশ এসেছে। মৌলবি কুবরার ঘটনারও উল্লেখ আছে। হেস্টিংস সাহেবের আসার খবরও রয়েছে। শিবালয় ঘাটে ও রামনগরে হই চই পড়ে গেছে। যার হাতে লাঠি, লোহার মাথাওয়ালা ডা-া, কুড়ুল, কাটারি বা ছোরা দেখতে পেল, কোতোয়াল হিম্মত সিং পাগলের মত তাদের ধরপাকড় করতে লাগল।

রাজা চেতসিংয়ের রাজনৈতিক অপরাধ কি, আর তাঁকে কেনই বা দূরে পাঠানো হচ্ছে, সে সব কথা এরা কিছুই জানে না। এদিকে নিজেদের ডোঙা নিয়ে জলের ঢেউ কাটতে কাটতে তারা শিবালয়ের খিড়কির নীচে এসে পৌঁছল। পাড়ে পড়ে থাকা পাথরে কোনরকমে দড়ি লাগিয়ে ডোঙা বাঁধল। তারপর বাঁদরের মত লাফ দিয়ে দিয়ে জানলার ভেতর ঢুকে পড়ল। ঠিক এই সময় রাজমাতা পান্না আর যুবরাজ চেতসিংকে উদ্দেশ করে বাবু মণিয়ার সিং বলছিল, 'আপনারা যদি এখানে থাকেন তাহলে আমরা যে কি করব তা বুঝে উঠতে পারছি না।

দেখা যাচ্ছে। তাদের দেখে খোলা জানলা সব বন্ধ হয়ে যায়। ভয় ও ত্রাসের রাজ্য যেন। কাশীর সমস্ত বীরত্ব যেন চকের চিথরু সিংয়ের বাড়ির উঠোনে বন্দী হয়েছে। সেখানে যেন কোতয়ালীর অভিনয় চলেছে। কে যেন চেঁচিয়ে ডাক দিল, 'হিম্মৎ সিং।'

জানলার ভেতর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে হিম্মৎ সিং প্রশ্ন করে, 'কে?'

'বাবু নন্‌হকু সিং।'

'তুমি কি এতক্ষণ বাইরেই ছিলে?'

'পাগল, রাজ্য বন্দী। সিপাইদের সব ছেড়ে দাও। আমি এদের সকলকে নিয়ে একবার শিবালয় ঘাটে যাই।'

'দাঁড়াও,' বলে হিম্মৎ সিং আদেশ দেয়। সিপাইরা সব বাইরে আসে। নন্‌হকুর তরবারি ঝনঝনিয়ে উঠল। সিপাইরা ভেতরে পালিয়ে গেল। নন্‌হকু বলে ওঠে, 'নিমকহারামের দল, কাপুরুষ কোথাকার, হাতে সব চুড়ি পরে নে।' লোকগুলোকে দেখতে দেখতে নন্‌হকু সিং চলে গেল। আবার সব নিশ্চুপ।

নন্‌হকু সিং আজ উন্মত্ত। ওর সাঙ্গপাঙ্গদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন আজ ওর কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রাজা চেতসিংয়ের রাজনৈতিক অপরাধ কি, আর তাঁকে কেনই বা দূরে পাঠানো হচ্ছে, সে সব কথা এরা কিছুই জানে না। এদিকে নিজেদের ডোঙা নিয়ে জলের ঢেউ কাটতে কাটতে তারা শিবালয়ের খিড়কির নীচে এসে পৌঁছল। পাড়ে পড়ে থাকা পাথরে কোনরকমে দড়ি লাগিয়ে ডোঙা বাঁধল। তারপর বাঁদরের মত লাফ দিয়ে দিয়ে জানলার ভেতর ঢুকে পড়ল। ঠিক এই সময় রাজমাতা পান্না আর যুবরাজ চেতসিংকে উদ্দেশ করে বাবু মণিয়ার সিং বলছিল, 'আপনারা যদি এখানে থাকেন তাহলে আমরা যে কি করব তা বুঝে উঠতে পারছি না। পুজোআচ্চা শেষ করে যদি আপনারা রামনগর চলে যেতেন তাহলে...'

তেজস্বিনী পান্না জবাব দেয়, 'এখন রামনগরে যাবই বা কেমন করে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণিরার সিং বলে, 'কি বলব, আমার সিপাইরা তো সব বন্দী।'

এমন সময় দরজায় কোলাহল শোনা গেল। রাজপরিবারের সবাই তখন শলাপরামর্শ নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে নন্‌হকুর উপস্থিতি কেউই লক্ষ্য করেনি। সামনের দরজা বন্ধ ছিল। নন্‌হকু সিং গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় একটা নৌকো ঘাটে পৌঁছবার জন্যে স্রোতের সঙ্গে যুঝছে। নন্‌হকু বেশ খুশি হয়ে ওঠে। এরই জন্যে ও এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

'মহারানী কোথায়?' ওর এই প্রশ্নে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে।

সবাই ফিরে দেখে। ...অপরিচিত এক বীর মূর্তি, যেন অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত এক দেবতা।

চেতসিং প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি?' 'রাজপরিবারের বিনা মাইনের গোলাম।' পান্না ছোট একটি নিশ্বাস ফেললেন। উনি চিনে ফেলেছেন। এত বছর পরে। সেই নন্‌হকু সিং।

মণিয়ার সিং জিগ্যেস করল, 'তুমি কি করতে পার?'

'আমি প্রাণ দিতে পারি। সবার আগে মহারানীকে ডোঙায় বসান। নীচে অন্য একটা ডোঙাতে ওস্তাদ মাঝিরা আছে। কথা পরে বলবেন।'

মণিয়ার সিং দেখতে পায়, অন্দরমহলের প্রতিহারী রাজার একটা ডিঙির কাছে চারজন মাঝি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডিঙিটা জানলায় লাগানো। পান্নাকে বলল, 'চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আরে...' পুত্রবৎসল পান্না চেতসিংয়ের দিকে তাকিয়ে এক প্রশ্ন করলেন। কেউ উত্তর দিতে পারল না। মণিয়ার সিং বলে ওঠে, 'তাহলে আমি এখানেই...?'

নন্‌হকু হেসে বলল, 'হুজুর, আমার মালিক নৌকোতে গিয়ে বসুন। যতক্ষণ না রাজাও নৌকোতে গিয়ে বসবেন ততক্ষণ সতেরোটা গুলি খেয়েও নন্‌হকু সিং খাড়া থাকবে।

পান্না নন্‌হকুর দিকে তাকালেন। এক নিমেষের জন্যে চারচোখ এক হল। দৃষ্টিতে জন্মজন্মান্তরের বিশ্বাস যেন দীপ্ত হয়ে উঠল। সদর দরজা জোর করে খোলার চেষ্টা চলছে বোঝা যায়।

নন্‌হকু প্রায় পাগলের মত বলে উঠল, 'হুজুর, তাড়াতাড়ি করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে পান্না নৌকোয় গিয়ে বসলেন আর নন্‌হকু সিং দরজার সামনে হস্টাকব্লএর মু খেমিুখি হল। চেতরাম এসে মণিয়ার সিংয়ের হাতে একটা চিঠি দিল। লেফ্‌টেন্যান্ট সাহেব বললেন, 'তোমার লোকরা গোলমাল আরম্ভ করেছে। আমার সিপাইরা এইবার গুলি চালালে আমি বাধা দিতে পারব না।' সাহেব আমার সিপাই এখানে কোথায়?' মণিয়ার সিং হেসে বলল। বাইরের কোলাহল তখন আরো বেড়ে গেছে।

চেতরাম নির্দেশ দেয়, 'সবার আগে চেতসিংকে বন্দী করুন।'

'কার এত সাহস আছে?' সদর্পে তরবারি খুলে মণিয়ার সিং রুখে দাঁড়াল। কথা তখনও শেষ হয়নি, কুবরা মৌলবি এসে হাজির। এখানে মৌলবি সাহেবের কারিকুরি চলবে না। পালাবার পথও বন্ধ। মৌলবি চেতরামকে হুকুম দিলেন, 'দেখছ কি?'

চেতরাম রাজার গায়ে হাত দিতেই নন্‌হকুর তরবারিতে তার হাত উড়ে গেল। হস্টাকর এগিয়ে এলেন। মৌলবিও চিৎকার শুরু করে দিল। চোখের নিমেষে হস্টাকর ও তার দলের কয়েকজনকে নন্‌হকু সিং ধরাশায়ী করল। মৌলবিরও আজ আর নিস্তার নেই।

নন্‌হকু সিং বলল, 'কেন, সেদিনকার রদ্দা খেয়েও শিক্ষা হয়নি, তবে দেখ পাজি', বলেই এমন সুন্দর হাতের খেল দেখাল যে এক কোপেই মৌলবি কাৎ। ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেলে যে কেউই তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

ননহকু সিং চেঁচিয়ে চেতসিংকে বলল, 'দেখছেন কি? নৌকোতে গিয়ে উঠুন। নন্‌হকুর ক্ষত থেকে তখন রক্তের ধারা বইছে। ওদিকে সদর দরজা দিয়ে ইংরেজদের দিশি সিপাইরা ঢুকতে থাকে। চেতসিং জানলা দিয়ে নীচে নামার সময় দেখতে পেলেন অগুন্তি সিপাইদের সঙ্গীনের সামনে দাঁড়িয়ে নন্‌হকু অবিচলিত ভাবে তরবারি ঘুরিয়ে চলেছে। অটল নন্‌হকুর পাথরের মত সবল দেহ থেকে গেরুয়া মাটির রক্তগঙ্গা বয়ে চলেছে। গুণ্ডার শরীরের এক একটা অঙ্গ কেটে পড়ছে! এই সেই কাশীর গুণ্ডা!

অনুবাদ **ইন্দ্রাণী সরকার**

লেখক পরিচিতি

জয়শঙ্কর প্রসাদ (১৮৮৯১৯৩৬)এর জন ্ম উত্তর প্রদেশের বেনারস শহরে। ইনি মূলত কবি ও নাট্যকার। উপন্যাস ও গল্পও লিখেছেন। এঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ কায়ামনী। নাটকের মধ্যে 'স্কন্দগ্রপ্ত' আর 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রসিদ্ধ। নামকরা উপন্যাস 'তিতলী' ও 'কঙ্কাল'। 'ছায়া', প্রতিধ্বনি', ইন্দ্রজাল', 'আঁধি', আকাশদীপ' প্রভৃতি গল্পের রচয়িতা।

marico

KEEP YOUR SKIN MOISTURIZED FOR 24 HOURS

EXPERIENCE IRRESISTIBLY SOFT AND SMOOTH SKIN WITH NEW PARACHUTE ADVANSED BODY LOTION.

It contains the goodness of Coconut Milk and 100% Natural Moisturizer that penetrates deep into your skin and nourishes it from within. Your skin is moisturized up to 24hrs.

Parachute® BODY LOTION
ADVANSED™

ম হা ত্মা গা ন্ধী

শান্তিকামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা

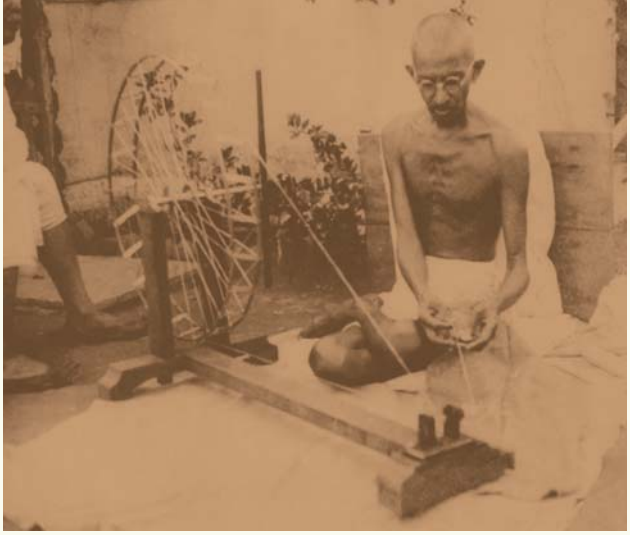

ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম নিয়ামক, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ও প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে এক বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অধিকার আদায় করে তিনি প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারতে ফিরে এই অহিংস মতবাদ ও দর্শনের ধারণা তিনি ব্রিটিশ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে সফল হন।

১৮৮৩ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি বাবামা য়ের পছন্দের পাত্রী কস্তুরবা মাখাঞ্জিকে বিয়ে করেন। তাঁদের ৪ পুত্র সন্তান জন্মে– এঁরা হলেন হরিলাল (জন্ম ১৮৮৮), মণিলাল (জ. ১৮৯২), রামদাস (জ. ১৮৯৭) ও দেবদাস (জ. ১৯০০)। পোরবন্দর ও রাজকোটে মাঝারি মানের ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয়ে তরুণ গান্ধী ১৮৮৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হন। ব্যারিস্টারি শেষে আবদুল্লাহ কোম্পানির আইনজীবী হিসেবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে তিনি মোটামুটি ২২ বছর অতিবাহিত করেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং বর্ণবাদী অপশাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নেন। আপসহীন নেতৃত্বের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল ইয়ান ক্রিস্টিয়ান স্মুট তাঁর সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হন।

ভারতে ফিরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। তাঁর সাংগাঠনিক দক্ষতায় মুগ্ধ গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁকে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মহামতি গোখলে হলেন সেই প্রাজ্ঞ রাজনীতিক যিনি উচ্চারণ করেছিলেন বাঙালির পক্ষে পরম শ্লাঘনীয় বাণী– What Bengal thinks today, India thinks tomorrow।

ভারতে গান্ধীজীর প্রথম আন্দোলন সত্যাগ্রহের মাধ্যমে চম্পারণ বিক্ষোভ। সেটা ১৯১৮ সালের কথা। ভারতীয় সমাজে জমিদারদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের আক্রমণে কৃষকসমাজ সর্বস্বান্ত হয়, সীমাহীন দুর্ভোগে পড়ে। গান্ধীজী কৃষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এই বিক্ষোভ চলাকালে জনগণ গান্ধীজীকে বাপু ও মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত করে। সারা দেশে গান্ধীজীর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি স্বরাজের লক্ষ্যে নতুন সংবিধান গ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করেন। ফলে কংগ্রেস অভিজাতদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমজনতার সংগঠ নে রূপান্তরিত হয়। ১৯২২ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে ৬ বছরের কারাদ- দেওয়া হয়। কিন্তু এপেনডিসাইটিসের অপারেশনের পর '২৪ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজীর অবর্তমানে কংগ্রেসে বিভেদ দেখা দেয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন অংশ আইনসভায় দলের অংশগ্রহণ সমর্থন করেন, এর বিরোধিতা করেন রাজা গোপালাচারী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজি ভারতকে ডেমিনিয়ানের মর্যাদাদানের দাবি জানান। অন্যথায় পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে নতুন অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে হুমকি দেন। দলের তরুণ নেতৃত্ব ভারতের আশু স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ১৯৩০ সালের ৩০ জানুয়ারি লাহোরের জাতীয় কংগ্রেসে এই দিনটিকে জাতীয় স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছরেরই মার্চ মাসে তিনি ড্যান্ডি মার্চের আয়োজন করেন। নিজের হাতে লবণ তৈরির সংকল্প নিয়ে তিনি সমর্থনকদের সঙ্গে ৪০০ কিলোমিটার হেঁটে সবরমতী থেকে ড্যান্ডিতে পৌঁছন। এটি ছিল ব্রিটিশ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর অন্যতম সফল প্রয়াস। আন্দোলন দমনে সরকার তাঁর ৬০ হাজার সমর্থককে গ্রেফতার করে। জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। ১৯৩২ সালে তিনি দলিত নেতা বি আর আম্বেদকরের নতুন সংবিধানে অস্পৃশ্যদের জন্য আলাদা ইলেকটোরেটের দাবির বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করেন, অস্পৃশ্যদের বিচ্ছিন্ন নয়, বরং জাতীয় জীবনের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি তাদের 'হরিজন' আখ্যায়িত করে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৩৪ সালে তাঁকে হত্যার তিনটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৪১ সালে গান্ধীআরউইন চু ক্তির পর আন্দোলন বন্ধের শর্তে সরকার রাজবন্দীদের মুক্তিদানে রাজী হয়। গান্ধীজীকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তিনি করেন। লর্ড আরউইনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে লর্ড উইলিংডন জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং গান্ধীজীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এটা ছিল তাঁর প্রভাব কাটিয়ে তুলতে তাঁকে তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সরকারি প্রয়াস।

দ্রুত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্যে ভারতভাগের ব্রিটিশ চক্রান্ত 'ডিভাইড এন্ড রুল'এর নামা ন্তর ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব। কাজেই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ গান্ধীজী কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি। দেশভাগ ত্বরান্বিত করতে ১৯৪৬ সালে সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা বিহার ও পঞ্জাবে হিন্দুমুসলমান দা ঙ্গার সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৭ সালে ১৪১৫ আগ স্ট ভারত যখন দুশোবছরের ব্রিটিশ নাগপাশ থেকে মুক্ত হচ্ছে, গান্ধীজী নোয়াখালী কলকাতা বিহারে দাঙ্গা থামাতে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মানবতাবাদী গান্ধী মানবতার এই অপমান সহ্য করতে পারেননি।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি দিল্লির বিড়লা ভবনে এক সান্ধ্যপ্রার্থনা সভায় যোগ দেবার পথে নাথুরাম গডসে নামে এক যুবক তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে। তিনি দু'টিমাত্র শব্দই উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন– 'হে রাম'। তাঁর স্বপ্ন ছিল শোষণ অত্যাচার নিপীড়নমুক্ত প্রজাবান্ধব এক অসাম্প্রদায়িক ভারতের, এক রামরাজত্বের যেখানে সবাই সুশ্লেশা ন্তে বসবাস করবে।

গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর দেহভস্ম গঙ্গা, নীল, ভোলগা, টেমস প্রভৃতি বিশ্বের প্রধান কয়েকটি নদীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উত্তরকালে যিনি বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠবেন, তাঁর দেহভস্ম তো বিশ্বের সবখানেই ছড়িয়ে পড়া উচিত!

• নিজস্ব প্রতিবেদন

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫

৯ জানুয়ারি ২০১৫ ধানমন্ডির ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 'নতুন বছর ২০১৫' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের শিল্পী হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গীতসন্ধ্যা

৩ জানুয়ারি ২০১৫ গুলশান ইয়ুথ ক্লাব মাঠে আয়োজিত ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং উত্তরা ক্লাব লি.এর ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ

২ জানুয়ারি ২০১৫ ঢাকায় 'ব্র্যাক ব্যাংক দৌড়: মানবতার জন্য ম্যারাথন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অভীক দেব এবং অভয়া দত্তের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra January 2015

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।
আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:
১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯
০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত